ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজবংশী সংস্কৃতি রূপান্তরের ধারা

যোড়শ শতকের গোড়ায় কোচ রাজবংশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে রাজবংশী জনগোষ্ঠী যেমন সংগঠিত হয় তেমনি সমাজ ও সংস্কৃতি পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। মহারাজা বিশ্বসিংহ সিংহাসনে আরোহন করেই হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। কাশীচন্দ্র ভট্টাচার্যের নিকট শৈবধর্মে দীক্ষিত হন। যদিও বিশ্বসিংহের রাজ্যলাভের সময় থেকেই হিন্দু ধর্মাবলম্বনের সূত্রপাত হয়েছে এই উক্তির সমর্থনে যথার্থ যুক্তির কোন প্রামাণ্য নথি নেই। বিশ্বসিংহের পুত্রের সমসাময়িক ঐতিহাসিক শেখ আবুল ফজলের 'আকবর নামা' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে বিশ্বসিংহের মাতা জল্পেশ্বর শিবের আরাধনা করে তাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। সুতরাং বিশ্বসিংহের মাতা-পিতা যে হিন্দু ছিলেন তা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে।[১] তাছাড়া কোচ-রাজবংশ উত্থানের আগে কামতাপুরে তিনজন খেন বংশের নৃপতি - নীলধ্বজ (১৪৪০-১৪৬০ খ্রি:), চক্রধ্বজ (১৪৬০-১৪৮০ খ্রি:) এবং নীলাম্বর (১৪৮০-১৪৯৮ খ্রি:) রাজত্ব করেন। নীলাম্বরের রাজত্বকালে রাজ্যের সীমানাও বহুদূর বিস্তার লাভ করে। এরা 'কান্তেশ্বর' নামে পরিচিত ছিলেন। এদের আরাধ্য দেবীও ছিল 'কামতেশ্বরী'। দেবী দুর্গার প্রতিরূপ কামতেশ্বরী চণ্ডীর আরাধনা আজও প্রচলিত। রাজধানী ছিল বর্তমান দিনহাটা কোচবিহারের গোসানীমারী। নীলাম্বরের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে গৌড়ের হোসেন শাহের সৈন্যদের আক্রমণে খেন রাজবংশের অবসান ঘটে। সে সময়কার ঘটনা, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয়ে হিন্দু ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তবে এটা বলা যায় কোচ-রাজবংশের যথার্থ প্রতিষ্ঠা ও মহারাজা বিশ্বসিংহের সময়কালে (১৫১০-১৫২৮ খ্রি:) ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অর্থাৎ হিন্দুধর্মের সংগঠন বিস্তার লাভের সূচনা হয়। বিশ্বসিংহ নিজে শিব ও দুর্গার উপাসক ছিলেন। 'তিনি কনৌজ, কাশী এবং অন্যান্য স্থান থেকে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে আনয়ন এবং তাহাদিগকে স্বরাজ্যে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের পুত্র বল্লভাটাচার্যকে শ্রীক্ষেত্র থেকে আনয়ন পূর্বক তাহাকে তিনি কামাখ্যাদেবীর সেবাপূজায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন।'[২]

একথা বলা যায় মহারাজা বিশ্বসিংহের রাজত্বকালের সময় থেকেই বহিরাগত বিশেষ করে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মানুষের আগমন ঘটে। এই ধারা পরবর্তী সময়কালেও অব্যাহত থাকে। মহারাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে এসে রাজ উদ্যোগে মিথিলা ও গৌড় প্রভৃতি স্থান থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিয়ে ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করে বিভিন্ন মন্দিরে পূজা-অর্চনার কাজে নিয়োজিত করা হয়। এমনকী রাজসভাতেও তাদের স্থান দেওয়া হয়। সংস্কৃত শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়।[৩] এটা বলা যায় যে কোচ-রাজবংশকে ঘিরে বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠী যেমন সংগঠিত হয় তেমনি আর্যীকরণের পর সাংস্কৃতায়নের সামাজিক প্রক্রিয়ায় রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সামাজিকীকরণ ঘটে দ্রুতগতিতে। রাজবংশী সমাজে বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্ভুক্তি ঘটে — সেটাও রাজানুগ্রহে। মহারাজা নরনারায়ণের সময়কালে শংকরদেবের আগমন ঘটে তার 'একশরণ' ধর্ম এবং 'নাম ঘোষা' গীতের প্রচলন ঘটে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মধ্যে। রাজবংশী সমাজে শংকরদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব সুদূর প্রসারী। 'অসমের বৈষ্ণব ধর্মগুরু কোচবিহার রাজ্যে শংকরদেব মহারাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে আশ্রয় নেন এবং একশরণ বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন।'[৪] মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সময়কালে বৈষ্ণব ধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। শংকরদেবের ভাবশিষ্য মাধব দেব এবং দামোদর দেব পরবর্তীকালে কোচবিহার রাজ্যে এসে বসবাস করেন। মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণ স্বয়ং বৈষ্ণব ধর্মের দীক্ষা নেন। মাধব দেব ও দামোদর দেবের প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম কোচ-রাজ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। অনেকের অনুমান বৈষ্ণব ধর্মের অনুভাবেই কোচ-মহারাজাগণ নারায়ণ উপাধি ধারণ করেন নরনারায়ণের সময়কাল থেকে। এই এলাকায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ঘটে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে নয় অসমের ধর্মগুরু শংকরদেবের প্রভাবে। রাধাবিহীন বিষ্ণুরূপী কৃষ্ণের একক আরাধনা প্রচলিত হয় 'মদনমোহন' নামে। 'মদনমোহন' কোচ-রাজবংশের কুলদেবতা হিসাবে আখ্যায়িত। সেই সাক্ষ্য আজও বহন করে চলেছে। বলা যায় রাজবংশী সমাজে শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ঘটে অনেক পরে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষজনের সংস্পর্শে। কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গে দেশ বিভাজিত হওয়ার পর পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষজন বিষয়-আশয়ের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিকেও নিয়ে এসেছিলেন। এদের প্রভাবেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এই এলাকার মানুষজনের মধ্যে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব ও ভাবনায় রাজবংশী সমাজও হরি সংকীর্তনে মেতে ওঠে। অনুরূপভাবে

অনেক লৌকিক দেবীও ঠাঁই পায় পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাঙালি সমাজের পূজা-অর্চনা ও বিশ্বাস ভাবনা অনুসরণে। বলা যেতে পারে ধর্মীয় ভাবনার সম্প্রসারণ ঘটে অনুগ্রহণ, আত্তীকরণের মেলবন্ধনে। স্বাভাবিকভাবে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারাটি তরান্বিত হয়।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ১২ সেপ্টেম্বর রাজতন্ত্রাধীন কোচবিহার রাজ্য গণতান্ত্রিক ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি কোচবিহার পরিণত হয় একটি জেলায়। উল্লেখ্য বর্তমান জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং দার্জিলিং জেলার বৃহদাংশই একদা এই কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নিম্ন আসাম সহ অন্যান্য অঞ্চলও ছিল। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনিক স্বার্থে জেলাওয়ারী বিভাজন করে। এই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজবংশীদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ধ্যানধারণা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রসারিত হতে সাহায্য করে। বলা যেতে পারে বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাবনা এতদঞ্চলের রাজবংশীদের মনোভাব অনুযায়ী বরাবরই ছিল। স্বাভাবিকভাবে বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বিষয়ে কোচবিহার ও পার্শ্ববর্তী জেলা জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের প্রসঙ্গটি বেশি করে আসে। বৃহত্তর রাজবংশীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ভিন্নভাবে আধারিত হয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর কিংবা মালদহে। পার্শ্ববর্তী প্রদেশ বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে নেপাল কিংবা বাংলাদেশের প্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাছাড়া মালদহ ও দার্জিলিং দীর্ঘকাল ভাগলপুর ডিভিসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দার্জিলিং জেলায় নেপালি ভাষাভাষী বহু মানুষের আগমন ঘটে। বৃহত্তর বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাব তো আছেই। তাছাড়া মালদহ জেলায় সংখ্যাগত দিক থেকে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর অবস্থান কোচবিহার বা আলিপুরদুয়ার জেলার মত নয়। সেখানে সামাজিক সংগঠনও ভিন্নভাবে গড়ে উঠেছে। বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ওপর কোচ-রাজবংশের প্রভাব অনস্বীকার্য এবং সর্বাংশে পরিবর্তনের অনুসারী। রাজপরিবারবর্গের ভাবনা ও অনুসরণকে রাজবংশী জনগোষ্ঠী শুরু থেকেই অনুগ্রহণ করে। সেটা শুরু হয় মহারাজা বিশ্বসিংহের ধর্মীয় আচরণ ও ভাবনাকে সূত্র করে। তাছাড়া কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা চারটিতে সকল রাজবংশীদের মধ্যে আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সমতা দেখা যায়। সেইসঙ্গে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক পরিসর যেহেতু অনেকাংশে লৌকিক ধর্মাশ্রীত, স্বাভাবিকভাবে ধর্মীয় বোধের সঙ্গে সঙ্গে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক ভাবনাও সেভাবে সম্প্রসারিত হয়।

রাজপরিবারের সঙ্গে বাইরের অরাজবংশী পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন এবং সামগ্রিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের উপরও পড়ে। এই পরিবর্তন ভেতর ও বাহির দু'দিক থেকেই সম্পন্ন হতে থাকে। প্রাচীনকাল থেকেই কোচবিহারের সংস্কৃতি পরিবর্তনের এই ধারা অব্যাহত ছিল এবং বলা যায় সূচনাকাল থেকে। তবে সেই পরিবর্তনের ধারাও পরিবর্তিত হয় সময়ের সাথে সাথে। সেখানে কোচ-রাজবংশের যেমন প্রভাব তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। শেষদিকে মনীষী পঞ্চানন বর্মার সমাজ সংস্কারও একটি বড় পরিবর্তন ঘটায়। উল্লেখ্য প্রাচীনকাল থেকে রাজবংশী সমাজের পরিবর্তন হলেও রাজবংশী সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতির অবয়ব সম্পূর্ণ মাত্রায় ছিল। বিদেশীদের আগমনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু তারপরেই বহিরাগতদের কোচবিহার সহ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে স্থায়ীভাবে বসবাসের ফলে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক ধারা অনেকটা পশ্চাদপসরণ হতে হতে বর্তমানে অনেকাংশে ম্লান হয়েছে। রাষ্ট্রনৈতিক কারণে এটা ঘটেছে। দেশ বিভাজন, বাংলাদেশের '৭১ এর মুক্তি যুদ্ধ কিংবা আসাম, মেঘালয় নেপাল, ভুটানের রাজনৈতিক কারণেও বহু মানুষের আগমন ঘটে, তারা কোন না কোনভাবে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দাও হয়ে ওঠে। এর সম্পূর্ণ প্রভাব রাজবংশী জনগোষ্ঠীর উপর পড়ে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থার পরিবর্তন, সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের ফলে রাজবংশী সমাজ একটা সমস্যার সম্মুখীন হয় বইকি এবং এটা ইতিগতভাবে সত্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বিংশ শতাব্দীর সূচনায় রাজবংশী জাতির পরিচয় নিয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসকবৃন্দের কাছে এবং তথাকথিত বর্ণহিন্দুদের ভাবনায় বিভ্রান্তি তৈরি হয়। বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মানুষজন এর প্রতিবাদে সংঘবদ্ধ হয়। গড়ে ওঠে ক্ষত্রিয় সমিতি ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে। রাজবংশীরা ক্ষত্রিয় জাতি এবং কোচদের থেকে উন্নত এই ভাবনায় আন্দোলন সংঘটিত হলে ব্রিটিশ সরকার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় যে রাজবংশীরা ক্ষত্রিয় এবং কোচদের থেকে ভিন্ন। ব্রিটিশ প্রশাসক ও ম্যালে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য — "... There is no doubt that at the present day irrespective of any question of origin, the Rajbanshi and the Koch are separate castes." ক্ষয়িষ্ণু রাজবংশী সমাজকে তার চিন্তা ও মননের দ্বারা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বকীয়তা, সম্মান ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে মনীষী পঞ্চানন বর্মা আজীবন লড়াই করেছেন। মনীষী পঞ্চানন

বর্মাই ছিলেন ক্ষত্রিয় সমিতির পুরোধা পুরুষ। পঞ্চানন বর্মার আবির্ভাব বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলন প্রথম থেকেই বর্ণহিন্দু সমাজের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। বর্ণহিন্দু সমাজ রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় মর্যাদা দিতে সহজে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলস্বরূপ অনেক ব্রাহ্মণ রাজবংশীদের ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়া আচার সম্পাদনে অস্বীকার করে। তবে মিথিলা, কামরূপ ও স্থানীয় কিছু ব্রাহ্মণ রাজবংশীদের সমর্থন ও আন্দোলনে সামিল হন। পঞ্চানন বর্মা রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী নিয়ে তৎকালীন পণ্ডিতবর্গের মতামত গ্রহণ করেন। কোচবিহারের পণ্ডিত মহামোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থনাথ বিদ্যাবাগীশ ও অন্যান্য; কামরূপের দিগেশ্বর ভট্টাচার্য ও অন্যান্য; কলিকাতার পণ্ডিত শ্রেষ্ঠা মহামোপাধ্যায় কামাক্ষ্যানাথ শর্মা ও অন্যান্য, রংপুরের পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন ও অন্যান্য, নবদ্বীপের ভুবনমোহন শর্মা ও অন্যান্য; কাশিধামের (বেনারস) বামশাস্ত্রী ভট্টাচার্য, পণ্ডিত চন্দ্রভূষণ শর্মা ও অন্যান্য এবং মিথিলার মহামোহপাধ্যায়, চিত্রধর মিশ্র ও অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ তাঁদের মতামত ব্যক্ত করে বলেন যে রাজবংশীরা ক্ষত্রিয় ও তারা 'উপবীত' গ্রহণ করতে পারেন। তিনি উপবীত গ্রহণের ব্যবস্থাও (২৭ মাঘ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ) করেন। উপবীত গ্রহণ রাজবংশীদের কাছে ক্ষত্রিয় ধর্মের প্রতীক স্বরূপ গৃহীত হয়। তিনি শুধু এই উপবীত গ্রহণের মধ্যেই ক্ষাত্র পরিচয়কে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি রাজবংশী জাতির সামগ্রিক উন্নতি (সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি) সহ আচার ধর্মের সংস্কারেও উদ্যোগী হন। উপবীত গ্রহণ করে রাজবংশীরা দাস, সরকার ইত্যাদি উপাধি পরিত্যাগ করে ক্ষত্রিয় পদবি বর্মন, বর্মা, রায়, সিংহ প্রভৃতি গ্রহণ করেন। এছাড়াও বর্ণহিন্দুদের ন্যায় সমাজে বাল্যবিবাহ, পর্দা প্রথা প্রভৃতি প্রচলন করেন। ব্রাহ্মণ, পুরোহিত দ্বারা বিভিন্ন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার রীতিও শুরু হয়। সমাজে নিত্যপূজা, সন্ধ্যা আহ্নিক, গায়ত্রী মন্ত্রোচ্চারণ, গীতাপাঠ ইত্যাদি শুরু হয়। এই উদ্দেশ্যে ক্ষত্রিয় সমিতি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করে ঘরে ঘরে বিতরণ করে। ধর্মীয় সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে পঞ্চানন বর্মার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শক্তির প্রতীক হিসাবে 'চণ্ডীপূজার'ও প্রচলন ঘটে। বলা যায় এর পর থেকেই রাজবংশী সমাজের আচার-সংস্কার সহ সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। ক্ষত্রিয় সমিতির এই উদ্যোগে বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের রাজবংশী মানুষের আচরিত ধর্ম ও অভ্যাসে কিছু পরিবর্তনও ঘটায়। খাবার দাবার থেকে ধর্মীয় আচার-সংস্কারে কিছু বিষয় যুক্ত বিযুক্ত হয়। ক্ষাত্রধর্ম পালনের বিষয়ে সমাজকে সচেতন করেন।

এছাড়াও এই জাতির উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেন। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য একসময় উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে অন্যান্য ধর্মের প্রতি ঝুঁকেছিল, সেই সময়ে পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয় আন্দোলন রাজবংশীদের হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। এখানেই পঞ্চানন বর্মার কৃতিত্ব এবং ক্ষত্রিয় আন্দোলনের গুরুত্ব। যদিও তার সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। বলতে দ্বিধা নেই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে পঞ্চানন বর্মা রাজবংশী সমাজ ধর্মকে ক্ষাত্রপথে পরিচালিত করেন। বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর জাতি স্বীকৃতি আদায় ও সংগঠিত করে আজকের সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং বলা যায় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও একটি পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক শ্রীচৈতন্যদেব কোচ রাজ্যে আসেননি। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবধারা এই এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে। তবে সেটা ব্যাপকতা পায় অনেক দেরিতে। বলা যেতে পারে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। এখানে বিশেষ করে রাজবংশী সমাজে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করেছিলেন শংকরদেব ও তার দুই শিষ্য মাধব দেব ও দামোদর দেব। মহারাজা নরনারায়ণের সময় প্রবর্তিত 'একশরণ' কথাই ছিল একমাত্র কৃষ্ণের উপাসনা। শংকরদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মে কোনপ্রকার জাতিভেদ প্রথা ছিল না। তার শিষ্য মাধব দেব প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মমত 'মহাপুরুষিয়া' বলে পরিচিতি পায়। 'একশরণ' ধর্ম রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করে। তাছাড়া বৈষ্ণব ধর্ম কোচবিহার রাজ্যে এবং অসমে ঝুম চাষ থেকে স্থায়ী কৃষি অর্থনীতির বিস্তারে সহায়তা করে, সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী কোচ, মেচ উপজাতির মধ্যে হিন্দুধর্ম বিস্তারে সহায়তা করে এবং স্তুপীকৃত গৃহ নির্মাণ পদ্ধতির পরিবর্তে ভিতযুক্ত মাটির গৃহ নির্মাণ পদ্ধতির প্রচলনে সহায়তা করেছিল। মহারাজা নরনারায়ণ এবং পরবর্তী রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ বৈষ্ণব ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণ বৈষ্ণব ধর্মকে রাজধর্ম হিসাবে ঘোষণা করেন। শংকরদেব ও তার শিষ্যদের প্রভাবে কোচ রাজ্যে বৈষ্ণব ধর্মের ভাবধারা বিস্তার লাভ করে। রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষজন এই ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন। বাড়ি বাড়ি তুলসী তলা, সন্ধ্যা প্রদীপ প্রজ্জ্বলন রীতি আচারের অন্তর্ভুক্ত হয়। শৈব ভাবনার পাশাপাশি বৈষ্ণব ভাবনার সম্প্রসারণ ঘটে। শঙ্করদেবের প্রভাবেই কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে যে কৃষ্ণ পূজিত হন তা একক কৃষ্ণ। এই প্রভাবেই মদনমোহন মন্দির সহ রাজ্যের অন্যত্র বিভিন্ন মন্দিরে একক কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠা পায় এমনকী

বাড়ির ঠাকুরবাড়ির থানেও। পরবর্তীকালে কৃষ্ণ ভাবনার সম্পৃক্তায়ন ঘটে বিশ্বাস ভাবনা তৎসহ দেবতার কল্পনায়। যেমন গোরখনাথ, রাখাল ঠাকুর, মদনকাম ঠাকুর প্রভৃতি। গানের কথায়ও কৃষ্ণ আশ্রয় পায়। দেহতত্ত্ব, মনঃশিক্ষা গানেও কৃষ্ণের অন্তর্ভুক্তি ঘটে। পালাগানের আসর বন্দনায় কৃষ্ণকে স্মরণ করতে থাকে শিল্পী-গীদালরা। কীর্তিনীয়াদের (রাজবংশী সমাজে পারলৌকিক ক্রিয়াদির সময় কীর্তন করেন) মৃত্যুজনিত শ্রাদ্ধ-শান্তির গানে-কথায় কৃষ্ণের সংযুক্তি ঘটে। বিষ্ণুরূপী কৃষ্ণের ভাবনার প্রসার ঘটে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতিতে। কিন্তু সেখানে রাধাকৃষ্ণের যুগল ভাবনার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারার সম্পৃক্তি ঘটে অনেক পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। শ্রীচৈতন্যদেবের ‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে’ এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর মন্ত্র সারা বাংলাদেশকে আলোড়িত করলেও রাজবংশী সমাজ শংকরদেবের ‘নামঘোষা’য় মগ্ন ছিলেন। কোচবিহার তথা বৃহত্তর রাজবংশী সমাজে তখন শংকরদেবের একশরণ নাম ধর্মেরই প্রচার ও প্রসার। ততদিনে পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে রাজবংশী সমাজ আন্দোলিত হচ্ছে এবং সমাজ সংস্কারের পর্ব চলছিল। দেশ বিভাজিত হওয়ার মুহূর্তে পূর্ববঙ্গ থেকে বর্ণহিন্দু মানুষজনের আগমনও শুরু হয়। চা-বাগান সূত্রেও অনেকে আসে। তারা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তারাই বিষয়-আশয়ের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি ও ভাবনাকে নিয়ে আসে। এদের প্রভাবেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম এদতাঞ্চলে সাবেক মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। শ্রীচৈতন্য প্রভাবে রাজবংশী সমাজ হরি সংকীর্তনে মেতে ওঠে। গ্রামের হাট কিংবা খোলা মন্দিরে গড়ে ওঠে হরিমন্দির। রাজবংশী সমাজ ও বর্ণহিন্দুদের যৌথ উদ্যোগেই হরিমন্দিরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এক ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা যায় রামপুর (কোচবিহার জেলা), আলিপুরদুয়ার হাটখোলা, চিকলীগুড়ি, কামাখ্যাগুড়ি (আলিপুরদুয়ার জেলা) থেকে মেখলিগঞ্জ, হলদিবাড়ির হাট সমস্ত জায়গাতেই হরিমন্দির গড়ে ওঠে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষদিকে কিংবা তার পরবর্তী সময়ে। রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি আবর্তিত হতে শুরু করে শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনায়। গ্রাম ঠাকুরের পাট কিংবা মেলার মাঠগুলি হয়ে যায় হরিমন্দির। হরিবোলা ঠাকুরের আবির্ভাব ঘটে। গ্রামের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় স্থল হয়ে ওঠে হরিমন্দিরগুলি। ততদিনে অধিকারী পুরোহিতদের আগমনও ঘটে যায়। গুরু কর্তারও প্রভাব শুরু হয়। এখন তো অষ্টপ্রহর হরি সংকীর্তনের ব্যাপক প্রসার, সবখানেই ফি-বছর আয়োজন হয় সপ্তাহব্যাপী। বৃহত্তর

রাজবংশী সমাজও এর বাইরে নয়। বরং বিগত দুই-তিন দশকে রাজবংশী মানুষজনের বেশিরভাগই এখন বৈষ্ণব ভক্ত। তুলসীর মালা ধারণ করে তিলক কেটে ঘুরে বেড়াতেও দেখা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের রীতিনীতি তিথি নক্ষত্র ধরে তারা পালন করছেন। তবে একটি বিষয় উল্লেখ্য রাজবংশী সমাজের আর্থ- সামাজিক কাঠামোর অবনমন, কৃষিভূমি থেকে রাজবংশী সমাজের বিচ্যুতি সেইসঙ্গে সামাজিকভাবে প্রান্তিক হওয়ার ফলে রাজবংশী সমাজের মানুষজন বেশি বেশি করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার বশবর্তী হয়েছেন। সমীক্ষায় এটাই ধরা পড়ে। হতাশাবোধ থেকে সামাজিকভাবে নিজেকে প্রকাশ করবার ভাবনা থেকেও এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার প্রসার ঘটে রাজবংশী সমাজে। রাজবংশী সমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামো যত দুর্বল হয়েছে ততই বিপুল সংখ্যক মানুষ এই ভক্তিরসে সামিল হয়ে দেহাতীত সুখের সন্ধান করছেন। সেখানে হতাশাবোধ যেমন একটা কারণ আবার প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়া, যান্ত্রিকতা, ভোগবাদী দুনিয়ার কাছে নিজেদের গুটিয়ে নেওয়ার প্রবণতাও দায়ী। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলায় এটা লক্ষণীয়। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় তো এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার ব্যাপক প্রভাব, প্রায় ৯০ শতাংশ রাজবংশী মানুষই এখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্ত। গুরু-গোঁসাইর ব্যাপক প্রভাব। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারে এই গুরু-গোঁসাইরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এখানে কোচ, দেশীয়া, পলিয়া একযোগে সম্মিলিত হয়েছে। আচরিত কৃত্যাদির মধ্যেও বৈষ্ণবী রীতি সংস্কার এখন বাড়ি বাড়ি। বিয়ের পরই তুলসীমালা ধারণ এখন অবশ্য রীতির মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।বিয়ে, মৃত্যুর আচারাদিও পরিবর্তিত হয়েছে। তবে একটি বিষয় উল্লেখ্য শংকরদেব প্রচলিত বৈষ্ণব মতাদর্শ বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের আদর্শায়িত লোকায়ত সংস্কৃতির বিশেষ ক্ষতি করেনি। আগ্রাসী কোন বিষয়ও ছিল না। কিন্তু চৈতন্যীয় মতাদর্শে বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের লোকায়ত অঙ্গন যায় বদলে। আচার-সংস্কারের পরিবর্তন ঘটে। রাজবংশী সমাজ ও পরিবারের চিরায়ত রূপটি পাল্টে যায়। সর্বোপরি ভাষা, শব্দের ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সে ধারা আজও অব্যাহত।[৫] তবে গুরু-গোঁসাইয়ের প্রভাব কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলায় কম হলেও মেখলিগঞ্জ, হলদিবাড়ি, শিলিগুড়ির রাঙাপানি, খড়িবাড়ি, নকশালবাড়ি এলাকায় এখনও আছে। আর উত্তর দিনাজপুরের তপন, কুশমণ্ডি, বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর, কালিয়াগঞ্জ এলাকায় তথা মালদহ জেলার একলাখি পান্ডুয়া এলাকায় গুরুদেব গোঁসাইয়ের

প্রভাব যথেষ্টই বেড়েছে। আর সব মিলিয়ে লৌকিক আচার আচরণের মধ্যেও একটা ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষণীয়। পালনীয় আচার কৃত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রাচীন রাজবংশী জনগোষ্ঠীর অনেক কিছু আজ লোকান্তরের পথে। বিগত কয়েক দশকে সেটা বেশি বেশি করে দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় এই চিত্র পরিসংখ্যানে উঠে আসে।

প্রায় সাড়ে চারশ বছর আগে এতদঞ্চলে বৈষ্ণবীয় ভাবনা প্রসারিত হয়। শংকরদেবের ধ্যান জ্ঞানে রাজবংশী সমাজের সবাই অনুরক্ত হয়। তুলসী তলা, সন্ধ্যা প্রদীপ, সংকীর্তন ডাকনাম ইত্যাদি প্রচলিত হয়। লোকায়ত মূল সংস্কৃতির পরিসরটি অক্ষুণ্ণই থাকে, বরং উর্বর হয়। শৈব শাক্ত ভাবনার পাশাপাশি বৈষ্ণব ভাবের সম্পৃক্তায়ন ঘটে। অন্যদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে। শুরু হয় লোক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। বিশেষ করে ভাষার ক্ষেত্রে। গৌড়ীয় চৈতন্যীয় প্রভাবেই অধিকারী পুরোহিতদের প্রভাব বাড়তে থাকে। কীর্তনের শাখাপ্রশাখা আরও বিস্তৃত হয়। রাজবংশী সমাজের দেহতত্ত্ব, তুক্ষা, মনঃশিক্ষার মত কিছু গানে বৈষ্ণবীয় ভাবনা সংযোজিত হয়। মন্ত্রের শব্দ ভাষা পাল্টে যায়। নতুন নতুন গান রচিত হয়। তুলসীধারী, অধিকারী গোঁসাইরাও নবদ্বীপ থেকে গান সংগ্রহ করে নিজেদের ভাষা শব্দ ব্যবহার করে গান রচনা করতে থাকেন। ফলে রাজবংশী ভাষায় বহু কীর্তনের সন্ধান পাওয়া যায়। অন্যান্য ধর্মীয় গীতে দেশীয় শব্দের সঙ্গে অন্যান্য শব্দ ঢুকতে থাকে। পালা নাটকগুলি তার অন্যতম উদাহরণ। রামায়ণ, মহাভারত কিংবা সামাজিক ঘটনাকেন্দ্রিক পালাগানের কথায় বাংলা শব্দের সংযোজন ঘটে। মান্যতা পেয়ে যায়। আর এভাবে লোকসঙ্গীতের ভাষা, উচ্চারণ ভঙ্গি এমনকী অনেক অনুষ্ঠানের অবয়ব পালটে যায়। যার ফলে পালাগান, লোকনাটক, কুশান কিংবা বিষহরা পালাতেও ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

রাজবংশী সমাজে একদা হরিবাড়ির ভিন্ন গুরুত্ব ছিল। সমস্ত ধরনের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হত এই হরিমন্দিরে। গ্রামের মঙ্গলার্থে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজাও সম্পন্ন হত। কীর্তন ধর্মকথার আসরও বসত। গোঁসাই, বোষ্টম কিংবা ভবঘুরে গায়ক-গায়িকাদের নিয়েও আসর বসত। এই হরিবাড়িগুলি নির্মিত হয় রাজবংশী কোন উদ্যোগী মানুষের আগ্রহে, তারই জমিতে এবং তারই দানে। অন্যান্যরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই উদ্যোগে সামিল হয়। এই হরিবাড়িকে কেন্দ্র করে গ্রামের বারো মাসের তেরো পার্বণ, লোকায়ত উৎসবগুলি সম্পন্ন হত। হরিলুঠ, খই

ছিটানো, বাঁশপূজা, মদনকামের গান, ডাকনামের আসর, গোরখনাথের মাগন যাত্রাও হরিবাড়ির মাহাত্ম্যে আবর্তিত হত। উদ্যোগে থাকত গ্রামেরই কিছু উৎসাহী মানুষ। পালাগানের আসরও বসত ফি-বছর। এই হরিবাড়িগুলি 'হরিমন্দিরে' পরিবর্তিত হয় অনেক পরে স্বাধীনতার পাশাপাশি সময়ে। হরিনাম সংকীর্তনের আসর বসতে থাকে নিয়মিত। শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাজবংশী সমাজও এই মহানাম সংকীর্তনের অংশ হয়ে ওঠে। শংকরীয় বৈষ্ণবভাবের প্রভাব কমে রাজবংশী সমাজও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবাদর্শের অনুগামী হয়ে পাড়ায়-পাড়ায় কীর্তনের দল তৈরি করে। বিভিন্ন পর্বের অনুষ্ঠানে সেটা গৃহপ্রবেশই হোক, ব্রত তিথি পালন কিংবা শ্রাদ্ধশান্তি সবেতেই সংকীর্তনের বিষয়টি আবশ্যিক হয়ে ওঠে। আর কিছু মানুষ রাজবংশী সমাজে যারা পিছিয়ে পড়ছে তারা হতাশাবোধ থেকে ঐকান্তিক ঐশ্বরিক সুখের খোঁজে শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবাদর্শের অনুরক্ত হয়ে কাপলে তিলক কেটে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেন। মন্দির দেবস্থলে এরা সমবেত হতে শুরু করে। বিগত কয়েক দশকে রাজবংশী সমাজে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবাদর্শের বিপুল প্রসার এভাবেই ঘটেছে। রাজবংশী সমাজের গরিষ্ঠ অংশই এখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্ত।

স্বাভাবিকভাবে একটি প্রশ্ন আসে এই বৈষ্ণব প্রভাব কিংবা অন্য কোন ধর্মগুরুর প্রভাবে রাজবংশী সমাজের বৃহত্তর লোকায়ত সংস্কৃতির পরিসরটি কীভাবে বদলে যাচ্ছে। কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তের যেমন আচরণীয় কিছু কৃত্যাদি আছে তেমনি অন্যান্য ধর্মগুরুর ক্ষেত্রে কিছু অনুশাসন মেনে চলতে হয়। সেটা বালক ব্রহ্মচারী, স্বামী স্বরূপানন্দ থেকে অনুকূল ঠাকুর অবধি। বিশেষ করে অনুকূল ঠাকুরের শিষ্যদের বেশ কিছু নিয়ম রীতি সকলকে মেনে চলতে হয়। সেখানে লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে পার্থক্য বর্তমান। জন্ম অশৌচ, মৃত্যু অশৌচ, বৈষ্ণব সেবার যেমন নিজস্ব নিয়ম আছে তেমনি বিয়ের ক্ষেত্রে কণ্ঠি বদলের বিষয়টি কিংবা মৃত্যু অশৌচের ক্ষেত্রে ৪-৫ দিনের নিয়ম রীতি পালনের পর ছয় গোঁসাই অর্থাৎ বৈষ্ণব এনে বিশুদ্ধিকরণের রীতি উল্লেখ্য। অনুকূল ঠাকুরের ক্ষেত্রে তো বিবিধ আচার যোজন-যাজন, উপযোজনা, ইষ্টভৃতি ইত্যাদি নিয়ম আচার পালনীয় কর্তব্য। এর উত্তরে নির্দ্ধিধায় বলা যায় রাজবংশী সমাজের নিজস্ব লোকায়ত সংস্কৃতির বলয়টি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। রাজবংশী সমাজের চিরায়ত সাংস্কৃতিক বিন্যাসের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।

বিভিন্ন কারণে সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটে। মিশ্রণও ঘটে। আবার আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে লোক সংস্কৃতির অবয়ব বদলায়। লোকসংস্কৃতি একটি চলমান স্রোত। আর রাজবংশী সমাজ যেহেতু একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এবং বহু জনশাখার সমন্বয় ঘটেছে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত ও সময়ের স্রোতপ্রবাহে। স্বাভাবিকভাবে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনে একাধিক বিষয় ও প্রক্রিয়া কার্যকরী হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মগুরু, বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠনের প্রভাব সর্বোপরি ধর্মীয় আবর্তে লোকসাংস্কৃতিক পরিসরটির সংযোজন বিয়োজন ঘটেছে। বিশ্বায়নের কড়াল গ্রাসকেও অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। বিভিন্ন জনস্রোতের প্রভাব, আর্যীকরণ, ক্ষত্রিয়করণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার বাইরেও আর্থ-সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ (Assimilation), সাংস্কৃতিক অধিগ্রহণ (Borrowal), সাংস্কৃতিক অনুকরণ (Imitation), সংমিশ্রণ (Acculturation), আরোপণ (Imposition) ইত্যাদি প্রক্রিয়া কার্যকরী হয়েছে। সেইসঙ্গে প্রগতি, শিক্ষা, যোগাযোগ সহ অন্যান্য ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলেও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বিষয়টি সচল হয়েছে। বিভিন্ন সংস্কৃতির চাপ, আগ্রাসন, আধুনিক করে তোলার প্রবণতাও বিবর্তনের কারণ হয়ে উঠেছে। তবে উল্লেখ্য এতদ্‌সত্ত্বেও রাজবংশী সমাজের লোকায়ত সংস্কৃতির নৃ-গোষ্ঠীগত ঐতিহ্যের একটি অংশ আজও রাজবংশী সমাজ নীরবে নিভৃতে অনুসরণ করে চলেছে। অনেক কিছুকে গ্রহণ বর্জন করেও বিশেষ এক সংস্কৃতির পরিসরকে লালন পালন করে যাচ্ছে রাজবংশী সমাজ এবং এই লৌকিক বৃত্তের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির নৃ-গোষ্ঠীগত কৌম পরিচয় ও ধারা চিহ্ন।

রাজবংশী সমাজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের পর্যায়ক্রম

- কোচ-রাজবংশ প্রতিষ্ঠা।
- মহারাজা বিশ্বসিংহের সময়কালে হিন্দুত্বকরণ ও পৃষ্ঠপোষকতা (১৫১০ খ্রিস্টাব্দ)

- শংকরদেবের ‘একশরণ’ (শরণীয়াকরণ) ধর্ম।
- মহারাজা নরনারায়ণের সময়কালে পৃষ্ঠপোষকতা
- শংকরদেবের আবির্ভাব।
- মাধব দেব, দামোদর দেবের আগমন।(১৫২৮-১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ)

- গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রভাব (অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার প্রবেশ।)
- অধিকারী পুরোহিতদের অন্তর্ভুক্তি।
- পরবর্তীকালে বর্ণহিন্দুদের আগমনে ত্বরান্বিত হয়।

- পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয়করণ ও সংস্কার আন্দোলন। (ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে সূচনা ঘটে)

- স্বাধীনোত্তর সময়ে বিভিন্ন ধর্মগুরুদের প্রতি আসক্তি।

- **পূজা-পার্বণ ও আচার-সংস্কার**

বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে ভারতবর্ষে কোন প্রাচীন সমাজই আদিম ভাবধারা নিয়ে সম্পূর্ণভাবে চলতে পারেনি, আধুনিকতার অপ্রতিরোধ্য ভাবধারার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে চলাটাই স্বাভাবিকভাবে লক্ষ করা গেছে; সেখানে রাজবংশী সমাজও তার বিপ্রতীপে থাকেনি। তারাও এই প্রক্রিয়ায় সম্মিলিত হয়েছে। কিছু পরিবর্তন, গ্রহণ বর্জনকে স্বীকার করে নিয়ে নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি তথা পূজা-পার্বণ ও আচার-সংস্কৃতি বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়েছে। আচার-ব্যবহার, পোশাক-আশাক, খাবার-দাবার এমনকী ভাষাভঙ্গিও বদলে যাচ্ছে। দৈহিক গঠনের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যেতে থাকে আন্তর্বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের বিন্যাসে। স্বাভাবিকভাবে আচরিত ধর্মানুষ্ঠানের অনেকগুলি লোকান্তরিত আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ক্রম পরিবর্তনে। ফলে অনেক দেবদেবীর নাম পাওয়া যায়, কিন্তু পূজা অনুষ্ঠানের নিদর্শন মেলে না। অনেক পাল-পরবেরও সংকোচন ঘটে মানসিকতা ও পরিবেশগত কারণে। ব্রতকথা তো হারিয়েই গেছে বলা যায়। সবক্ষেত্রেই একাধিক কারণ ও বিষয় সামগ্রিক পরিবর্তনে সহায়ক হয়েছে। এক কথায় কারণ ও ঘটনা একমাত্রিক নয় বহুমাত্রিক।

রাজবংশী সমাজ কৌমভাবনায় সম্পৃক্ত হয়েছে আদিমকাল থেকে। লোকায়ত কৌমজীবন থেকেই কোচ রাজবংশের জন্ম। রাজবংশী যখন কৌম জীবনে বসবাস করত তখন তারা প্রকৃতি সমন্বিত। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা অর্চনা করত অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দেবদেবীরই প্রাধান্য ছিল। যেমন - নদীর দেবদেবী, অরণ্যের দেবদেবী, পর্বতের দেবদেবী, বৃষ্টির দেবদেবী এবং বিভিন্ন জীবজন্তুর দেবদেবী প্রভৃতি। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে রাজবংশীরা এইসব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে আধুনিক বিশ্বাস, পদ্ধতি ও ভাবনার শরিক হয়েছে। তাই রাজবংশী সমাজ আগের মত প্রাকৃতিক পূজা-অর্চনা আর কৃত্যাদি পালন করে না। যেমন বৃক্ষ পূজা, পাথর পূজা, মহাকাল ঠাকুর, বনদুর্গা এমনকী বিষহরি প্রভৃতি।

রাজবংশী সমাজ অতীতে সম্পূর্ণভাবে কৃষিনির্ভর ছিল। আর্থ-সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের ফলে রাজবংশী সমাজের একটা বড় অংশ কৃষি থেকে বিচ্যুত হয়। তারা ভিন্ন ভিন্ন পেশায় ছড়িয়ে পড়ে। অতীতে যে রাজবংশী সমাজ মাটি কাটার কাজ থেকে চা-বাগানের কাজকে অস্বীকার করেছে তারাই এখন অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক, দিনমজুর, ভেণ্ডার, ইটভাটা, ছোটখাটো

ব্যবসা এমনকী যে কোন ধরনের চাকুরিতেও যুক্ত হতে বাধ্য হয়েছে। কয়েক দশকে উত্তরবঙ্গের বহু রাজবংশী যুবক কাজের সন্ধানে পাড়ি দিয়েছে ভিন প্রদেশে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জেলার এমন কোন গ্রাম নেই যে গ্রাম থেকে এক-দুজন যুবক রাজস্থান, হরিয়ানা, দিল্লী, কেরালায় কাজের সন্ধানে পাড়ি দেয়নি। জয়পুরে তো রাজবংশী মহল্লাই তৈরি হয়েছে। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার ক্ষেত্রেও ছবিটি প্রায় একইরকম। বলতে দ্বিধা নেই বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের একটা বৃহৎ অংশ এখন কৃষি থেকে বিচ্যুত। এর ফলে সাংস্কৃতিক সংকট তৈরি হয়েছে। উত্তরবঙ্গে কাজের সুযোগ বিস্তৃতি না ঘটলে এই সমস্যা আরো বাড়বে। বিশেষ করে রাজবংশী সমাজের ক্ষেত্রে। বিগত কয়েক দশকে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ভূমিহীন রাজবংশী পরিবারগুলির ক্ষেত্রে। অপেক্ষাকৃত তরুণ প্রজন্ম আজকে ভিনদেশী। তারা সেখানে দারোয়ান থেকে হোটেল বয়, প্লাইউড ফ্যাক্টরী থেকে রাজমিস্ত্রি সবেতেই কাজ খুঁজে নিচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির পক্ষে বিষয়টি উদ্বেগের। কারণ তাদের সন্তান-সন্ততিরা ভিন্ন সংস্কৃতির শরিক হয়ে উঠছে। এটা শহরাঞ্চলে বসবাসকারী রাজবংশী পরিবারের ক্ষেত্রেও কিছুটা প্রযোজ্য। কারণ তাদের সন্তান-সন্ততিরাও রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির পরিসর থেকে সরে যাচ্ছে। তারাও সুযোগ পাচ্ছে না রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির পরিসরটি জানতে। ফ্ল্যাট কালচারে অনেকেই ছেলে মেয়েকে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির আড়ালে বড়ো করছেন। সেইসঙ্গে বিয়েতে বর্ণহিন্দু বা অন্য গোষ্ঠীর প্রতিও আগ্রহ দেখাচ্ছেন। রাজবংশী সমাজের কৃষ্টি সংস্কৃতির মধ্যে উর্বরা সংস্কৃতি অর্থাৎ Fertility Cult এর প্রভাব উল্লেখযোগ্য। কৃষিকেন্দ্রিক আচার অনুষ্ঠান তো বটেই দেবদেবীর কল্পনায় ও পূজা-অর্চনার উপাচারেও এই ভাবনার প্রকাশ পাওয়া যায়। বিভিন্ন উৎসব এবং উৎসব কেন্দ্রিক সংগীতেও উর্বরা ভাবনা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। বিষুয়া, বৈশাখী-আষাঢ়ী সেবা, আমাতি (অম্বুবাচি), ধানের ফল আনা, ক্ষেতিলক্ষ্মী পূজা, পুষুনা, বুড়াবুড়ি, চড়ক ইত্যাদি পূজা ও উৎসবকে সম্পূর্ণভাবে কৃষিভিত্তিক পূজা-পার্বণ বলা যায়। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে কৃষিকর্মের সূত্রে উর্বরতাকেন্দ্রিক বহু সংস্কার পালন করে রাজবংশী সমাজ। অনাবৃষ্টিজনিত খরা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে মহিলাদের সমবেতভাবে হুদুম দ্যাও পূজা এবং আনুষঙ্গিক কৃত্যাদি উর্বরা ভাবনারই দৃষ্টান্ত। রাজবংশী সমাজের নদীকে দেবী হিসাবে পূজা, তিস্তাবুড়ি তার মধ্যে অন্যতম এবং তৎসংশ্লিষ্ট মেচেনী খেলা ও গান সেখানেও কৃষি ও উর্বরতা ভাবনা সক্রিয়। উত্তরবঙ্গের

সর্বত্রই গ্রামঠাকুর বিভিন্ন নামে পূজা পায়, বিশেষ করে রাজবংশী সমাজে। এই পূজা সাধারণত কৃষিজমি রোপণযোগ্য করার পর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের দিকে সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ হৈমন্তিক ধান (হেউতি ধান) বোনার বিছন বা চারাগাছ জমিতে রোপণ করার পূর্বে গ্রাম ঠাকুরের পূজার আয়োজন হয়। এই পূজার সঙ্গেও কৃষি উর্বরার সম্পর্ক স্পষ্ট। থানছিড়ি বা স্থানশ্রীর ঠাকুরের সঙ্গেও কৃষির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কেননা ধান্যচ্ছেদনের পরই ধানের শীষগুলি তার প্রতীক বাঁশের দণ্ডে বেঁধে রাখা হয়।

রাজবংশী সমাজে শিব হল অন্যতম দেবতা। মহারাজা বিশ্বসিংহ স্বয়ং শৈবধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। উত্তরবঙ্গে শিব বহু নামে পরিচিত। জল্পেশ্বর, জটেশ্বর, সর্বেশ্বর, বাণেশ্বর আবার দিনাজপুরে মহারাজা ঠাকুরও শিবেরই প্রতিভূ। মালদহে যেমন গম্ভীরা। আবার মহাকালও শিবেরই আরেক রূপ। মাশানও শিবের সঙ্গে সম্পর্কিত দেবতা। ব্র্যাঘ্র দেবতা। রাজবংশী সমাজে শিব ঘরের মানুষ, কৃষির দেবতা। শিবের প্রতীকগুলির মধ্যেই (বৃষ, সর্প, লিঙ্গ) উর্বরতা তথা কৃষি ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। শিব আঞ্চলিক রূপে গ্রাম ঠাকুর, গ্রাম পাহারা দেয় — আঞ্চলিক নামও বহুরূপে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নামে পূজা পায়। রাজবংশী সমাজে শিবের বহুরূপ, বহু নামে আখ্যায়িত হয়ে লৌকিক বৃত্তকে অনন্য করেছে। রাজবংশী সমাজ আরও কিছু দেবদেবীর পূজা করে। যেমন - সোনা রায় (বন্যজন্তুর দেবতা) গোরখনাথ (গোপালকদের দেবতা) মদনকাম (কাম দেবতা) বলরাম (লাঙল দেবতা) এবং বিষহরি (সর্পদেবী)[৬] রাজবংশী সমাজে মনসা-বিষহরি আরেক অন্যতম স্ত্রী-দেবতা। বিষহরির থান সমস্ত রাজবংশী বাড়িতেই বর্তমান। বিয়ে বা শুভকার্যের আগে বিষহরির মাড়েয়া গানের আসর বসে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ জেলাতেও রাজবংশী সমাজে মনসামঙ্গলের প্রভাব আজও বিদ্যমান। এইক্ষেত্রে দেশিয়া, পলিয়াদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। মূলত: ঝাড়-জঙ্গল ঘেরা উত্তরবঙ্গের সর্পভীতির কারণে মনসা বিষহরির প্রভাব বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে রাজবংশী সমাজে। এই পূজার সঙ্গে উর্বরা ভাবনা নিহিত আছে।

শিবের যেমন বহুরূপে রাজবংশী সমাজে অবস্থান তেমনি শক্তির প্রতীক কালীরও বহুরূপে মান্যতা। এখানে বৌদ্ধীয় ভাবনার সম্প্রসারণ ঘটেছে যেমন - তারা কালী, চামুণ্ডা কালী আবার আঞ্চলিকভেদে কালির বহু নাম বুড়ি কালী, বোকালী, পাঁচ কালী, কাঁচা কালী, পেটকাটি কালি।

মালদহ জেলায় যেমন জহুরা কালী রাজবংশী সমাজেও মান্যতা পেয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে তো বহু নামের কালির ছড়াছড়ি। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য রাজবংশী সমাজে দেবতার জন্য বিশেষ এক স্থান থাকে। যেখানে বিষহরি, কালী, শিতলা, শিব, বুড়াঠাকুর, পীর প্রভৃতি সমস্ত দেবদেবী মূলত: চালাঘরেই স্থান পায়। এই স্থানটি ঠাকুরবাড়ি, ঠাকুরের পাট হিসাবে পরিচিত। মন্দির খুব কম বাড়িতে দেখা যায়। দশমীর দিন রাজবংশী সমাজের যাত্রা পূজা করার রীতি। এই যাত্রাপূজায় অনুষ্ঠিত হালযাত্রা, গবাদি পশুর পরিচর্যা ইত্যাদি কৃত্যাদিও আসলে কৃষিপূজার নামান্তর। যাত্রা পূজার আরেকটি অন্যতম অনুষঙ্গ সরস্বতী পূজা অর্থাৎ বাণীবন্দনা। রাজবংশী সমাজে শারদীয়া দুর্গোৎসব মূলত: ভাণ্ডানী দেবীর পূজার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এই ভাণ্ডানী দেবীও কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত। ভাণ্ডানী দেবীর পূজা-উৎসব ও মেলা অতীতে বহু জায়গায় হত। হাল আমলে ময়নাগুড়ি, মাথাভাঙ্গা, কুমারগ্রামের মত এলাকাতেই সীমাবদ্ধ। লক্ষ্মীপূজা ও সরস্বতী পূজার রীতি রাজবংশী সমাজে কয়েক দশক আগেও প্রচলিত ছিল না। রাজবংশী সমাজের নিজস্ব পুরোহিত অধিকারীরাও এই পূজার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না। শারদীয়া দুর্গোৎসবও রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতিতে পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়। রাজবংশী সমাজে নবান্নোৎসবে যেমন শিয়াল ঠাকুরের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করা হয় তেমনি ব্যাঘ্রভীতি, ভাল্লুকভীতির কারণে সোনা রায়, মহাকাল, ভাণ্ডানী, শালশিরি পূজারও প্রচলন ঘটে। বৃক্ষ পূজা, বৃক্ষকে ঘিরে নানাবিধ সংস্কার ও বিশ্বাস বট-পাকুড়ের বিয়ে, জিগা গাছের সঙ্গে সখী পাতানো রাজবংশী সমাজের বহু প্রাচীন কালের বিশ্বাস ও রীতি। বৃক্ষোপসনার এক একটি অনুষঙ্গ। এক এক দেবতা একেক নামে পরিচিতি পেয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসে। যেমন - জুড়াবান্দা ঠাকুর জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কোচবিহার জেলায় এই দেবতাকে খড়-বিচালির জুড়া অর্থাৎ পুটলী উৎসর্গ করা হয় আবার উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় পীরযুক্ত হয়ে বিভিন্ন নামে পীরের দেবতা হয়েছে। রাজবংশী সমাজে বৃক্ষপূজার বহুবিধ আচার-সংস্কার আদিম সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করে। বর্তমানে অনেকাংশে এই বৃক্ষ পূজার রীতি প্রথা কমে গেলেও উত্তরবঙ্গের অনেক জায়গাতেই এখনও রাজবংশী সমাজের এই অনুসরণ চোখে পড়ে। যেমন বট-পাকুড়ের বিয়ের প্রথা কমে গেছে, আবার বন্ধ্যাত্ব মোচনের জন্য কিংবা শিশুর দীর্ঘ জীবন কামনায় জিগা গাছের সঙ্গে সখী পাতানোর বিষয়টি নজরে আসে না। এ প্রসঙ্গে বলতেই হয় আধুনিক সময়ের জ্ঞান-বিদ্যা ও

সংস্কৃতির প্রভাবে জিগা গাছের সঙ্গে সখী পাতানো কিংবা বট-পাকুড়ের বিয়ে বিষয়টিও গুরুত্ব হারিয়েছে। অন্যদিকে শালশিরি, সোনা রায়, ধরম ঠাকুর, রাখাল ঠাকুর, গোরখনাথের পূজাও লোকান্তরের পথে। হুদুম দ্যাও, কাতি পূজা ও উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ জীবন থেকে হারিয়ে গেছে বলা যায়। আবার মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় 'জলমাঙ্গা' বা 'জল কাঙাল' অনুষ্ঠানটিও অবলুপ্তির পথে। বৈশাখী ও আষাঢ়ী সেবার মত অনুষ্ঠানগুলি আর সম্পন্ন হয় না। এই অনুষ্ঠানটিও কৃষি কৃত্যেরই অংশ। তবে আমাতি অর্থাৎ অম্বুবাচীর কিছু নিয়ম আচার রাজবংশী পরিবারগুলি মেনে চলেন। পূজা-অর্চনার বিষয়গুলি লুপ্ত হলেও তিনদিন কৃষিকৃত্যাদি বন্ধ রেখে বসুধা দেবীকে স্মরণ করেন। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু জায়গায় কামাখ্যা দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা দেন। তার মধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলার কামাখ্যাগুড়ির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে রাভা সম্প্রদায়ের মানুষজনও কামাখ্যা দেবীকে পূজা করেন।

রাজবংশী সমাজে সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে নিজস্ব আচার বিশ্বাসের পাশাপাশি প্রাচীন বৌদ্ধীয় প্রভাব, শৈব প্রভাব, শাক্ত প্রভাব যেমন — মনসা, চণ্ডী, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতির প্রভাব পড়েছে তেমনি পরবর্তীকালে বর্ণহিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে পৌরাণিক প্রভাব, বৈষ্ণব প্রভাব, গৌরাঙ্গ প্রভাবও পড়েছে। বহু লৌকিক দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করে রাজবংশী সমাজ। তবে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে সহাবস্থানে রাজবংশী সমাজের ধর্মীয় আচরণ, দেবদেবী, পূজা-পার্বণ ও সাংস্কৃতিক অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটে। রাজবংশী সমাজের উপর বর্ণহিন্দুদের প্রভাবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দ্বারা পূজা-অর্চনা করার রীতির প্রচলন এবং মৃন্ময় মূর্তির সংযোজন।[৭] অতীতে রাজবংশীরা মাটির ঢিপি, পাথরকেই দেবদেবী জ্ঞানে পূজা-অর্চনা করতেন। আজও গ্রামেগঞ্জে মাটির ঢিপি, পাথরের থানে ঠাকুর বাড়ি দেখা গেলেও অনেক ক্ষেত্রে মাটির মূর্তির সংযোজন ঘটেছে। তাছাড়া দেবদেবীর পূজার পরিবর্তন কিংবা রূপান্তরের সূচনা আদপে ঘটে রাজন্যবর্গের সময়কালেই। রাজপরিবারের আগ্রহে শৈবধর্ম গৃহীত হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে কোচ-রাজবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি মহারাজা নরনারায়ণ মুদ্রার এক পিঠে 'শ্রী শ্রী শিবচরণ কমল মধুকরস্য' খোদাই করা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে তারা শৈবধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন।[৮] পরবর্তীকালে শুধু শৈবধর্ম নয় বিষ্ণুর প্রতিও রাজপরিবারের আগ্রহ বাড়তে থাকে।

এর সূত্র ধরে বলা যায় যে ধর্মের ক্ষেত্রে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের পরিবর্তে বৈষ্ণব ধর্মের সহজ সাধনা বা ভক্তিবাদের আবির্ভাব ঘটে। মহারাজা নরনারায়ণ শংকরদেবের প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন।[৯] মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সময়কালে বৈষ্ণব ধর্ম রাজধর্ম হিসাবে প্রচার পায়। রাজবংশী সমাজও ধীরে ধীরে রাজধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়। সংস্কার সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে। এইভাবে তারা তাদের সমাজের বাইরের ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং এর ফলে তাদের আদিম সংস্কৃতি ক্রমে ক্রমে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। এখনও পূর্বতন প্রজন্ম তাদের আদি দেবদেবীর আরাধনার চেষ্টা করছে কিন্তু তা শুধু আন্তরিকতায় কিংবা ভক্তির সাথে, কোনো জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে নয়। আবার সময়ের সাথে সাথে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকেও গ্রহণ করছে কোন বিরোধে না গিয়ে। স্বাভাবিকভাবে আদি দেবদেবী ও সংস্কৃতির গুরুত্ব হারাচ্ছে বর্তমান প্রজন্মের কাছে।

রাজবংশী সমাজে মৃন্ময় মূর্তির প্রচলন ছিল না। পরবর্তীকালে বর্ণহিন্দুদের সংস্পর্শে মাটির মূর্তির প্রচলন হয়। অতীতে শোলার মূর্তিই প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হত। মালি সম্প্রদায়ের একটা শ্রেণি এই শোলার কাজ করত। তারা বিষহরির মঞ্জুষ, বিয়ের মুকুট, কদম ফুল বানাতো। কিন্তু বর্তমানে শোলা দিয়ে মূর্তি বানানো বিশেষ দেখা যায় না। এর পরিবর্তে মাটির দ্বারা মূর্তির প্রাধান্য দেখা যায়। অনেকে বাড়িতে মাটির মূর্তিতেই মন্দির স্থাপন করেছেন।

উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বিষহরি মনসার প্রভাব পূর্বের মতই বর্তমান। কোচবিহার জেলায় ষাইটল বিষহরির প্রসার কয়েক দশকে কমেছে। একমাত্র কোচবিহার জেলাতেই এখনও কোন কোন বাড়িতে আসর বসে সন্তান কামনায়। মানত থাকলেই সাধারণত এখনও ষাইটল গিদালীর খোঁজ পড়ে। কোচবিহার ভেটাগুড়ির ফুলতী গীদালীর (বঙ্গরত্ন প্রাপক) দলটিই এখন অন্যতম। বলা যেতে পারে ফুলতী গীদালীই ষাইটল বিষহরির শেষ প্রতিনিধি। গ্রামগঞ্জে ষাইটল বিষহরির প্রভাবও কমেছে। মানত ও মনস্কামনার মানসিকতাও এখন হারিয়ে যাবার পথে। সেখানে বিষহরি মাড়েয়া গানের প্রভাবও কমেছে। বাড়ির কোন শুভ অনুষ্ঠানের (অন্নপ্রাশন, বিয়ে প্রভৃতি) আগে নিয়ম রক্ষার্থে আয়োজন হয় বটে সেটাও অল্প সময়ের (আগে ৩ দিন অথবা ৭ দিনের আসর বসত) জন্য, তাও অবস্থাপন্ন পরিবারের মধ্যে সীমিত। বেশিরভাগ পরিবার এখন সামান্য নৈবেদ্য নিবেদনের মধ্যেই সম্পন্ন করেন এই পর্বটি। উল্লেখ্য অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়া যেমন অন্যতম একটি কারণ তেমনি বর্ণহিন্দুদের সম্পর্কে মনন মানসিকতার পরিবর্তনও

অনেকাংশে দায়ী, সেইসঙ্গে বর্তমান প্রজন্ম এই বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ আগ্রহী নয়। তা সত্ত্বেও বলা যায় বিষহরি মনসার প্রভাব সব জেলার (উত্তরবঙ্গের) রাজবংশী সমাজের মধ্যে কমবেশি বর্তমান। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের রাজবংশী সমাজে মনসামঙ্গলের আসর বসে। মালদহ জেলার রাজবংশী সমাজে বিষহরি মনসার প্রভাব এখনও হারিয়ে যায়নি। গাজোল, হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় রাজবংশী সমাজের বিয়েতে এখনও চণ্ডীগানের পর মনসামঙ্গলের আসর বসে। অনেকেই বিষহরি পূজায় হাঁস বলি দেয়। আরেকটি বিষয় রাজবংশী সমাজ কিন্তু মনসা পূজার দিন মনসা পূজা করে না তারা তাদের মত করে মনসা বিষহরির উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য প্রদান করে। কোচবিহার জেলার সব মহকুমাতেই মাশানের পাট দেখা যায়। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার জেলাতেও মাশানের প্রভাব আছে, তবে কম। কোচবিহার জেলাতেই বেশি। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর-এ কালিয়াগঞ্জ এলাকায় কয়েকটি জায়গায় মাশানের পূজা হয়। কোচবিহার জেলার প্রায় সর্বত্রই মাশান ঠাকুরের প্রভাব। ১৮ প্রকার মাশানের বিশ্বাস রাজবংশী সমাজে। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য কোচবিহার জেলায় মাশান শুধু রাজবংশী সমাজের দেবতা নয়। বর্ণহিন্দুরা নস্য শেখ মুসলিম সমাজ সহ বর্ণহিন্দুদের একাংশের মধ্যেও যথেষ্ট প্রভাবশালী এই দেবতা। অনেক এলাকায় গ্রামভিত্তিক পূজাও সম্পন্ন হয়, সবাই অংশগ্রহণ করে, মানতের বশবর্তী হয়। এই দেবতার পূজার উপকরণে রাজবংশী সমাজের নৃ-গোষ্ঠীগত পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ এই দেবতার পাট যেমন সাধারণত নদী, জলাশয়, নিটকবর্তী এলাকায় তেমনি উপাচার হিসাবে মাছ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অতীতে শ্মশান এলাকাতেই মাশানের পাট ছিল। শ্মশান মাশান শব্দটি এইভাবে প্রচলিত হয়েছে। তাছাড়া মাশান ঠাকুরের প্রভাব রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে বলা যায় যথেষ্টই এবং ভীতিপ্রদ অপদেবতা। মাশান রাজবংশী সমাজের লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে অন্যতম এক দেবতা।

মদনকাম ঠাকুরের পূজা ও গান প্রায় অন্তরালের পথে। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ এলাকায় এখনও মদনকাম ঠাকুরের পূজা ও গানের প্রচলন থাকলেও অন্যত্র বিশেষ দেখা যায় না। মদনকাম ঠাকুরের প্রতীক বাঁশ। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং-এ ‘বাঁশ খেলার গান’ হিসাবে পরিচিত। কিন্তু কোথাও বিশেষ দেখা যায় না। তবে কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরে মদনকামের পূজা সহ কিছু প্রাচীন রীতি অনুসরণ করা হয়। এই পূজাটি আসলে বৃক্ষোপসনারই অঙ্গ। বাঁশ

এখানে মদনকাম ঠাকুর, মূলত: শিবেরই প্রতিরূপ। হিন্দু-মুসলিম (নস্য শেখ) সবার কাছে মান্য। ৫/৭টি বাঁশের মধ্যে একটি মাদার পীরের নামে রাখা হয়।

মহারাজ ঠাকুর উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ এলাকায় রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের দেবতা। রাজবংশীদের নিজস্ব পুরোহিত গোঁসাইরাও পূজা করেন। দুধ, কলা, চিনি, চিড়া সাধারণ উপকরণ। হৈমন্তিক ধান (হেউতি ধান) ওঠার পর ফাল্গুন মাসের দিকে সম্পন্ন হয়। ইদানীং মাটির মূর্তি, রাজকীয় বেশ, হস্তি বাহন, ত্রিভূজা, কোথাও হাতির বদলে ঘোড়া। অন্যত্র নেই, সম্ভবত ব্যক্তি দেবতাই গ্রাম দেবতা থেকে শিবের সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার অন্যত্র মহারাজ ঠাকুরের প্রচলন নেই। যখা আর এক দেবতা, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এলাকায় এই দেবতার প্রচলন থাকলেও বর্তমানে নেই। সময় ও পরিবেশে এই দেবতার লোকান্তরের পথে। যেমনটি হয়েছে সোনা রায় ঠাকুরের ক্ষেত্রে। এক সময় সোনা রায়ের পূজাকে ঘিরে বালকগণের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ছিল এবং বহু গ্রামে সম্পন্ন হত। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং জেলার রাজবংশী সমাজে সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রভাব থাকলেও অন্য জেলাগুলিতে নেই। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহে এই ঠাকুরের নাম শোনা যায় না।

পাঁচ-সাত দশক আগে রাজবংশী সমাজে ধর্ম ঠাকুর বা ধরম ঠাকুরের প্রভাব থাকলেও বর্তমানে নেই বললেই চলে। পূজা হত বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে। এইজন্য রাজবংশী সমাজে বৈশাখ মাস ধর্ম মাস হিসাবেও পরিচিত। পূজার উপকরণ ছিল সাদা। সাদা পাঁঠা, সাদা ষাঁড়, সাদা পায়রা। ষাঁড়, পাঁঠা ধর্ম ঠাকুরের নামে ছেড়ে দেওয়ার প্রথাও এখন বিশেষ নেই। ধর্মঠাকুরের নিকট সবাই পুত্র কন্যা ও সংসারের মঙ্গল কামনাই করত। ছেড়ে দেওয়া পাঁঠা, ষাঁড় ধর্ম ঠাকুরের নামেই ঘুরে বেড়াত। ধরম ঠাকুরের পূজাটি এখন অবলুপ্তির পথে। স্ত্রীলোকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই অনুষ্ঠানটি অবলুপ্তির অন্যতম একটি কারণ শৈব ভাবনার ব্যাপক প্রসার। ধরম ঠাকুরের প্রচলিত গানগুলিতেও শৈব প্রশস্তিই মুখ্য। অতীতে কিছু মানুষ পাত্র (লাউয়ের বস) নিয়ে বাড়ি বাড়ি ধরম ঠাকুরের গান করে ভিক্ষা করত। গান শেষে ভিক্ষার পাত্র পেছন দিকে রেখে ভিক্ষা নিত। ভিক্ষা না দেখার নিয়ম ছিল। এই ধরম ঠাকুর পূজা গান রাজবংশী সমাজের উপর সম্প্রদায়ের প্রভাবকে চিহ্নিত করে। ড. চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর 'দি রাজবংশীস অব নর্থবেঙ্গল'

গ্রন্থে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। ধরম ঠাকুর নাথ সম্প্রদায়ের দেবতা এবং রাজবংশীদের উপর নাথ ধর্মের প্রভাবের উদাহরণ এই ধরম ঠাকুর পূজা।[১০]

মহাকাল ঠাকুরের পূজা আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় বহুল জায়গাতেই সম্পন্ন হয়। আলিপুরদুয়ার জেলায় তো মহাকালগুড়ি, মহাকালধাম নামে জায়গা আছে। শিলিগুড়ি নকশালবাড়ির পথে ঘোষপুকুর এলাকায় 'মহাকাল ঠাকুরানি' পূজা হয়। হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে এই ঠাকুরানীর পূজা। বলা যেতে পারে শিবেরই পূজা। ড. চারুচন্দ্র সান্যালের মতে আলিপুরদুয়ার জেলার জটেশ্বর এবং কোচবিহার জেলার বাণেশ্বরের শিব মহাকাল।[১১] তবে উপাচার ও ভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন। লৌকিক মতেই শিবের আরাধনা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতে। সেটা কখন গ্রামঠাকুর হিসাবে পূজা পায়, কখন বুড়াঠাকুর হিসাবেও শিবের লৌকিক মতে আরাধনা। কুমারগ্রামে শিব রাজাঠাকুর আবার দিনাজপুরে মহারাজা ঠাকুর। ব্যক্তি দেবতা কখনও কখনও দেবতা হয়েছে, শেষে শিবের প্রতিরূপে মান্যতা পেয়েছে। উত্তরবঙ্গে শিবের ব্যাপক প্রসারে শিবের বহু লৌকিক রূপ। বর্ণহিন্দুদের মত নিছক শিবরাত্রি ব্রত কিংবা জল ঢালার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং নাম, প্রকৃতির সঙ্গে লৌকিক বিশ্বাস সংস্কারে সম্পৃক্ত হয়ে ঘরের দেবতা, গ্রামের দেবতা হয়ে পূজিত হয়। লৌকিক রূপের অনেকগুলির লোকান্তর ঘটলেও এখনও কিছু কিছু দেবতা আলাদাভাবে পূজিত হয়। সন্ন্যাসী ঠাকুর যেমন জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ সন্ন্যাসী হাট এলাকায় সাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। উত্তরবঙ্গের অন্য জায়গায় সন্ন্যাসী ঠাকুরের ব্যাপকতা হ্রাস পেয়েছে। অতীতে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ মহকুমায় মহা সমারোহে হত। জামালদহ এলাকায় শিব 'পাইলাভাসা' হিসাবে আখ্যায়িত। দিনহাটা এলাকাতেও হয়। দার্জিলিং জেলাতে সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূজার প্রচলন দু-এক জায়গায় আছে। উল্লেখ্য এখনও রাজবংশী সমাজের ঠাকুরের পাটে কিংবা গ্রাম থানে সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূজা দেওয়ার রীতি প্রচলিত। তবে যেহেতু অর্থনৈতিক কারণে রাজবংশীদের পূজা-পার্বণের সংখ্যা কমেছে স্বাভাবিকভাবে সন্ন্যাসী ঠাকুরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত প্রায়। উত্তরবঙ্গের মাত্র কয়েকটি জায়গাতেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের নাম শোনা যায়। উপাচারের ক্ষেত্রেও লৌকিক দুধ, চিনি কলা (বিচিযুক্ত) সঙ্গে ধুতুরা ফুল, গাঁজা দেওয়া প্রচলিত হলেও মদ দেওয়ার প্রথা উঠে গেছে। এছাড়া শিবের আরও বহু লৌকিক রূপ। বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষায় রাজবংশী সমাজ পূজা করে। শিবের অনুষঙ্গী

জল্পেশ্বর, বাণেশ্বর, জটেশ্বর, জটিলেশ্বর শুধু নয় রাজাঠাকুর, গ্রামঠাকুর, সন্ন্যাসী, ধূমবাবা, মহারাজ, মদনকাম, মাশান মহাকাল, সোনা রায়, গমীরা, বুড়াঠাকুর, ডাংধরা, যখা বিভিন্ন লৌকিক আধারে শিবেরই বিভিন্ন রূপ। শৈবদেশে শিবের বিচিত্র বিহার, বিভিন্ন উপাচার। রাজবংশী সমাজে অতীতে পাঁঠা, খাসি, হাঁস, পায়রা এমনকী শূকরও উৎসর্গ করা হত। কখনও বলি দিয়ে, কখনও মোচড় দিয়ে কখনওবা উছরণ অর্থাৎ শুধুমাত্র উৎসর্গ করে। বিভিন্ন রূপের সঙ্গে বিভিন্ন ভঙ্গি, বিচিত্র সব রীতিনীতি। সেটা বাণেশ্বরে যেমন দেখা যায়। খাসি মুচড়ে আছাড় দিয়ে মেরে উৎসর্গ করা হয়। আবার কুমারগ্রাম দুয়ারে রাজা ঠাকুরকে শূকরের মাথা দিয়ে পূজা দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। আরও উল্লেখ্য বিষয় এখন এইসব পূজাতে হরিনাম সংকীতনের ব্যবস্থাও করা হয়। অদ্ভুত সমন্বয়। অনেক প্রথার রীতির পরিবর্তন হচ্ছে রাজবংশী সমাজে। কালীও বহু নামে পূজিত। অতীতে তো তন্ত্রসাধনায় কালী মুখ্য দেবতা হিসাবে পরিগণিত হত রাজবংশী সমাজে। উত্তরবঙ্গের তরাই ডুয়ার্সে তন্ত্রসাধনার কয়েকটি ক্ষেত্রও ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বহু নামে কালীর সমারোহ, মুখোশেই পূজিত হয়। বাঁশুলি কালী, চামুন্ডা, বসন্ত কালী, মাশান কালী, সুর কালী, বাউ কালী, মাটি গুড়াইও কালীরই রূপভেদ। হাঁস, পায়রা, পাঁঠা বলিও হয়। মালদহ জেলায় চণ্ডী দেবীর ছড়াছড়ি - বুলবুল চণ্ডী, পাটাল চণ্ডী, রণচণ্ডী, রাইহোরনী, বাঁশরাণী, গোছিলা চণ্ডী রাজবংশী লোকজীবনে ছড়িয়ে আছে। নকশালবাড়ি এলাকার মহাকাল ঠাকুরানী কালীর লৌকিকরূপ আবার আলিপুরদুয়ার জেলার গাবুর ঠাকুর কালীরই ভিন্ন নাম। পূজার ক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন লৌকিক আচার। অনেক সময় গৃহকর্তাই দুধ, দই, কলা, চিনি দিয়েই পূজার কাজ সম্পন্ন করেন। উল্লেখ্য রাজবংশী সমাজে পূজার নৈবেদ্য হিসাবে (একমাত্র কলা ছাড়া) ফল ফলাদি বিশেষ ব্যবহার করা হয় না। ইদানীং প্রচলিত হয়েছে তবে সেটাও বেশি দিনের নয় কয়েক দশক আগের। অদ্ভুত শোনালেও আরেকটি বিষয় বর্তমানে অনেক পরিবারের সদস্যই পরিবারের ঠাকুরের পাটে সমস্ত দেবতার নাম জানে না। বংশ পরম্পরায় ঠাকুরের পাটে মাটির টিপিতেই বিভিন্ন ঠাকুরের পূজা সময়ে সময়ে সম্পন্ন হয়। স্বাভাবিকভাবে অনেক দেবতাই রাজবংশী সমাজ জীবন থেকে লোকান্তরিত হচ্ছে ধারাবাহিক বিচ্ছিন্নতার কারণে। উত্তর দিনাজপুর জেলায় বসুমতী ঠাকুরের পূজা যেমন প্রচলিত তেমনি রান্নাঘরের দেবী মেথিনীদেও। বিয়ের সময়ও পূজিত হয়। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে বাড়ির মালিক রান্না ঘরে এই দেবীর পূজা সম্পন্ন করেন।

‘দুয়ারী’, ‘কুয়ারী’, ‘মহামারী’ দেবীর পূজা এখনও গ্রামাঞ্চলে সম্পন্ন হয়। তবে বেশিরভাগ লৌকিক দেবদেবীর কোন মূর্তি নেই। মাটির বেদি, থান, বাঁশ, কলাগাছ, তুলসী ইত্যাদি প্রতীকেই দেবতার রূপ। এছাড়াও আরও কিছু লৌকিক দেবদেবী পূজা পান বছরের নানা সময়ে। যেমন ভুইরাজা, মাটি মড়াই, ছেপুয়ান, গোয়ালচণ্ডী, তিন বাড়া, ভেদাই, আটঘটি, অথাই পথাই, মুরলা কনকালী। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে এইসব লৌকিক দেবদেবীর অস্তিত্ব এখনও আছে। গ্রামাঞ্চলে নিয়মাচারে পালিত হলেও মফস্বল শহরাঞ্চলে অনেক দেবদেবীর অস্তিত্ব বিলীন। মাশানের রীতি সংস্কার, বেশ কিছু উপলক্ষ এখনও ঘিরে আছে। কিন্তু বিষহরি, সত্যপীর, চোরচুরনী নাচ গান এখন শুধুমাত্র গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত। তবে মুখোশকে বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতীকে পূজার রীতি এই দুই জেলার আলাদা বৈশিষ্ট্য।

কাতি পূজা রাজবংশী সমাজে একদা বহুল প্রচলিত থাকলেও বর্তমান মুষ্টিমেয় কিছু পরিবারের মধ্যেই মাত্র সম্পন্ন হয়। ব্রতের গানের পরিসরও হারিয়ে গেছে বলা যায়। পুত্র সন্তান কামনায় এই ব্রতানুষ্ঠান করত। এই পূজাকে ঘিরে নিম্ন আসামে নাচ, গান থাকলেও উত্তরবঙ্গ থেকে হারিয়ে গেছে বলা যায়।

উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও দার্জিলিং জেলাতে একসময় গমীরা ঠাকুর পূজা ও ভক্তিয়ার খেলার গান প্রচলিত ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহেও গম্ভীরার অনুষঙ্গে গমীরা ঠাকুরেরই উপাসনা। এই গমীরা ঠাকুর পূজা, ভক্তিয়ার খেলা ও গান এবং চড়ক সবগুলিই রাজবংশী সমাজের বিষুয়া পরবের সঙ্গে যুক্ত। বস্তুত বিষুয়া পরবের অনেক রীতি সংস্কারের মত এই অনুষ্ঠানগুলি সংকুচিত হয়েছে। বর্ণহিন্দুদের অংশগ্রহণ এবং রাজবংশী সমাজের নব্য প্রজন্মের অনীহায় আজ ভক্তিয়ার খেলা, গান বা চড়ক, গমীরা ঠাকুর পূজা খুব কমই দেখা যায়। তবে এখনও বিশুয়া পরবকে ঘিরে রাজবংশী সমাজ বেশ কিছু ব্যতিক্রমী নিয়মাচার পালন করে। বিশেষ করে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায়। এই দিনটির গুরুত্ব রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের ভিন্ন মাত্রার। নানাবিধ নিয়মাচার যুক্ত এই বিষুয়া পরবের গুরুত্বও হ্রাস পেয়েছে রাজবংশী সমাজে। কান্দির জল প্রস্তুত করার রীতি অবলুপ্ত হয়েছে। তুলসী গাছে ‘ঝরা’ (স্থানভেদে ‘ধরা’ দেওয়ার রীতিকে অনেকে ‘ঝরা’ দেওয়াও বলেন) দেওয়ার রীতিও এখন প্রায় অনেক পরিবারে পালন করা হয় না। শিকার করার প্রথা

তো উঠেই গেছে। ২২ প্রকার শাক খাওয়ার প্রথাও এখন আর দেখা যায় না। দুপুরবেলা ভাতের পরিবর্তে ‘ভাজাভুজা’ (‘ফাটাফুটা’ও বলে অনেক অঞ্চলে) খাওয়ার রীতি অনুসৃত হয় না। গ্রামাঞ্চলে কিছু কিছু পরিবার এই রীতির কিছু কিছু অনুসরণ করলেও শহরবাসী রাজবংশী ক্ষত্রিয়রা বিশেষ কোন নিয়ম রীতি অনুসরণ করে না। করার মানসিকতাও নষ্ট হয়েছে বিভিন্ন ভাবে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের পূজা-পার্বণ ও আচার সংস্কৃতির পরিসর অনেকটাই সংকুচিত। চার-পাঁচ দশক আগেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। লৌকিক দেবদেবীর পূজা-অর্চনার সাথে সাথে আচার-সংস্কারগুলি পালন করত। আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন একটা কারণ বটে তবে মানসিকতা পরিবর্তন, বৃত্তি ও পরিবেশগত বিষয়গুলিও গুরুত্বপূর্ণ কারণ। স্বাভাবিকভাবে রাজবংশী সমাজের পূজা-পার্বণ ও আচার-সংস্কৃতি বিবর্তনের পথে। অনেক কিছুই লোকান্তরের পথে। বিশেষ করে পূজা কেন্দ্রিক গান। সেইসঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে কিছু বাদ্যযন্ত্র। নীচের সারণীতে পূজাকেন্দ্রিক গানের তালিকাটি থেকে স্পষ্ট হয় যে অনেক কিছু আজকে বিলুপ্তির পথে। সেইসঙ্গে আমোদপ্রমোদ ভিত্তিক গান বাজনার প্রসঙ্গটিও নীচের তালিকায় উত্থাপিত হল।[১২]

রাজবংশী সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন গান-বাজনার বর্তমান পরিস্থিতি

পূজা-পার্বণ ও আমোদপ্রমোদভিত্তিক গান-বাজনা	বর্তমান পরিস্থিতি
১। উদাসী গান।	১। বিলুপ্ত।
২। কোরক পূজার গান (song of rain inducing)	২। প্রায় বিলুপ্ত।
৩। বিরুয়া গান (ওঝা - song of exorcist)	৩। প্রায় বিলুপ্ত।
৪। দোতারা গান (love song)	৪। প্রায় বিলুপ্ত।
৫। গোমীরা গান (religious song)	৫। প্রায় বিলুপ্ত।
৬। তিস্তা বুড়ির গান অথবা ভাদই খেলার গান (song of goddess of Tista River)	৬। জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে।
৭। মেচেনি খেলার গান (song of goddess of Tista River)	৭। জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে।
৮। বাঁশ খেলার গান।	৮। জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে।

৯। শিবের বিয়াও গান (song of marriage of God Siva)	৯। জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে।
১০। গোলাপী শরীর গান (song of a grown up unmarried girl)	১০। বিলুপ্ত।
১১। ভোট গান (song of the spirit of vote Thakur)	১১। বিলুপ্ত।
১২। বিয়াও-এর গান (marriage song)	১২। বিলুপ্ত।
১৩। কুশান যাত্রা (song of Ramayan)	১০। জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে।
১৪। বিষহরী গান (song of goddess of snake)	১১। জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে।
১৫। পালা গান বা পালাটিয়া (one kind of theatre)	১২। জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে।

রাজবংশী সমাজে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র সমূহের বর্তমান পরিস্থিতি

বাদ্যযন্ত্রসমূহ	অবলুপ্ত বা অবলুপ্ত প্রায়
১। সারিন্দা (like a violin)	১। অবলুপ্ত।
২। বেণা বা ব্যায়েনা।	২। অবলুপ্ত।
৩। উপাঙ্গো (wooden made)	৩। অবলুপ্ত।
৪। তাসি (wooden drume)	৪। অবলুপ্ত প্রায়।
৫। আকরাই (small tasi)	৫। অবলুপ্ত প্রায়।
৬। দোতারা (four stringed harb)	৬। অবলুপ্ত প্রায়।
৭। মোখা (flute made by bamboo)	৭। অবলুপ্ত প্রায়।
৮। সানাই (a flute)	৮। অবলুপ্ত প্রায়।
৯। ঝিল্লী (bamboobsheet)	৯। অবলুপ্ত প্রায়।
১০। রাম তাল (big cymbal made of brass or bell metal)	১০। অবলুপ্ত প্রায়।
১১। রাম শিংগা (horn of buffalo or bamboo or wood blow as a flute)	১১। অবলুপ্ত প্রায়।

● লোকায়ত সংস্কৃতি

স্বাধীনতার সময়কাল থেকে রাজবংশী সমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন শুরু হয়। পরবর্তীকালে বিপুল অভিবাসনে সেটা দ্রুত এবং ব্যাপক হয়। রাজবংশী গ্রাম সমাজের বিন্যাস পাল্টে যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ ও ১৯৫৩ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন উত্তরবাংলার আর্থ সামাজিক কাঠামোর ক্ষেত্রে এক নতুন রূপ নেয়। উত্তরবাংলার এক বিশাল সংখ্যক জোতদার বিশেষ করে রাজবংশী জোতদার তাদের জমি হারায়। এর ফলে জোতদাররা যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয় তেমনি রাজবংশী সমাজের কৃষক শ্রেণিও বিপুল ক্ষতির স্বীকার হয়। এদের মধ্যে এক বিরাট অংশ ছিল ভাগচাষি-আধিয়ার। আবার ভূমি সংস্কার আন্দোলনের বিলিবন্টন ব্যবস্থায় স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায় বিশেষ উপকার পায়নি। জমির ঊর্দ্ধসীমা বেঁধে দেওয়ার ফলে যারা পুরোপুরি ভূমি নির্ভর ছিলেন তারা দিশেহারা হয়ে পড়েন। বিশেষভাবে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। শুরুতে তারা এর তাপ যথেষ্ট অনুভব করতে না পারলেও ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম যুক্তফ্রন্টের সময় এর তাপ পেতে শুরু করে। অর্থাৎ বেনামি জমি বা খাসজমি উদ্ধার একটি সংকটের সৃষ্টি করে। জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি ও ভূমিসংস্কারের মতো প্রগতিশীল কার্যসূচি উত্তরবঙ্গের ভূমি নির্ভর রাজবংশী সমাজের মধ্যে এক অস্থির সমস্যার সৃষ্টি করে। কারণ ছয়ের দশক অবধি রাজবংশী সমাজ ভূমির বাইরে অন্য কোন পেশায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করার কথা কখনও ভাবেননি। বরং ঘোরতর বিমুখ ছিল। ফলত: উদ্ভূত সমস্যায় তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবে সমাজ সংস্কৃতির মধ্যে দোলাচল শুরু হয়। অত্যধিক উদ্বাস্তুর অনুপ্রবেশ ও স্থায়ীভাবে বসবাসের ফলে জমির উপর চাপ বাড়ে এবং চাষবাসের ক্ষেত্রে একপ্রকার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। সেইসঙ্গে অভিবাসন উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যার পরিসংখ্যানে অনেক পরিবর্তন আনে। রাজবংশী জাতির জীবনযাপন ও অভ্যাসের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়। সর্বোপরি স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ক্রমাগত বর্ণহিন্দুদের অভিবাসনের ফলে এতদঞ্চলের বাসিন্দাদের স্থায়ী আধিপত্যের উপর আঘাত আসে। আবার বর্ণহিন্দুদের সংস্পর্শে এবং একত্রে বসবাসের ফলে রাজবংশীদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির উপর চাপ বাড়তে থাকে। রাজবংশী সমাজের একাংশের মধ্যে বর্ণহিন্দু সংস্কৃতির গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং নিজের সংস্কৃতির মধ্যে যেন অজান্তেই পার্থক্য সৃষ্টি হতে থাকে। অবস্থাপন্ন রাজবংশীরা শহরে অভিবাসিত হতে থাকে, ছেলেমেয়েদের

উচ্চশিক্ষায় পাঠাতে আগ্রহী হয় ও পরিবারের ঐতিহ্যশালী পেশা কৃষিকাজ ছাড়া অন্যান্য পেশা গ্রহণেও আগ্রহী হয়। ক্রমাগত রাজবংশীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও জীবনশৈলীর পরিবর্তনের প্রতি আগ্রহী হতে বাধ্য হয়। তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পোষাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তে বর্ণহিন্দু সমাজের পোষাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করতে থাকে। আচার আচরণের পরিবর্তন ঘটায়। নিজের সমাজের তথাকথিত অনগ্রসর দলের কাছে নিজেদের উন্নততর ভাবতে থাকে। এর ফলে রাজবংশী সমাজের মধ্যে যে সাম্যতা ছিল তার অভাব ঘটতে থাকে এবং সমাজে অদৃশ্য এক উচ্চ ও নিম্নশ্রেণির উদ্ভব হয়।[১৩] সামাজিকভাবে অগ্রসর এইসব মানুষেরা তাদের অনগ্রসর রাজবংশীদের সঙ্গে মেলামেশাও বন্ধ করে দেয়, ফলে রাজবংশী সমাজের মধ্যে একপ্রকার সামাজিক বিভেদের জন্ম হয়।[১৪] অন্যদিকে জমিহারা, সর্বহারা রাজবংশীরা টিকে থাকার লড়াইয়ে দিনমজুর, ঠেলাওয়ালা, রিক্সাওয়ালা থেকে শহরাঞ্চলে কিংবা অন্যান্য প্রদেশে স্থানান্তরিত হয়। পাশাপাশি অভিবাসিত জনগণ বিভিন্ন ভাবে কৃষিকার্য, ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা চাকরি করে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে পরিণত হওয়ার ফলে চিরাচরিত গ্রামীণ কাঠামোটি বদলে যায়। অভিবাসিত জনগণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এতদঞ্চলের রাজবংশীরা কোন দিক থেকেই পেরে ওঠে না বরং আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে এক সংকটের আবর্তে অবতীর্ণ হয়। বলা যায় ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে। ফলে রাজবংশী সমাজ জীবন ও লোকায়ত সংস্কৃতির পরিসরটি ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে।

সময়ের স্রোতে শিক্ষা, যোগাযোগ তথা আধুনিকতার বিস্তার ঘটেছে। নগরায়ণও প্রসারিত হয়েছে। সংঘবদ্ধ জীবন গ্রামীণ জীবন থেকেও উধাও হয়েছে। বিশ্বায়িত বিজ্ঞাপনী প্রচারেও জনজীবন আর আবদ্ধ নয়। আবার বর্তমান প্রজন্মের কাছে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দৌলতে মিশ্র সংস্কৃতির হাতছানি। রাজবংশী সমাজও তার বাইরে নয়। দ্রুত পরিবর্তনের সাপেক্ষে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির লোকায়ত রূপটিও দ্রুত পরিবর্তমান। এমনি গ্রামীণ জীবনের কাঠামোর বদল ঘটেছে, জনবিন্যাসের চরিত্রও পালটেছে, রাজবংশী অধ্যুষিত গ্রামের সংখ্যাও এখন হাতে গোনা। সর্বোপরি রাজবংশী সমাজের মনন মানসিকতাও আর আগের মত নেই। বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন ভাবে সময় ও সংকটের আবর্তে আবর্তিত। জীবনযাপনের অভিমুখও আর আগের মত নেই। স্বাভাবিকভাবে লোকায়ত পরিসরটি অক্ষুণ্ণ থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও বলা যায়

রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির লোকায়ত পরিসরটি শত সমস্যায়ও একেবারে হারিয়ে যায়নি। অনেক পরিবর্তন ও গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে বজায় আছে। এখনও তাই গ্রামে গঞ্জে লোকায়ত সংস্কৃতির বিষয়গুলি নজরে আসে। রাজবংশী মানুষেরা সাধ্যমত পালনের চেষ্টা করে যাচ্ছে। শহর ও গ্রামের রাজবংশী মানুষের মধ্যে বিভেদরেখাও তৈরি হয়েছে। তা সত্ত্বেও লোকায়ত পরিসরটির বিষয়ে সবাই কমবেশি সচেতন। রাজবংশীদেরও একটা মধ্যবিত্ত সমাজ তৈরি হয়েছে। তাদের মধ্যে উন্নাসিকতা কিংবা বর্ণহিন্দুদের মত মনোভাবও তৈরি হয়েছে। কিন্তু বৃহত্তর রাজবংশী সমাজ আজও অনেক পরিবর্তনকে মেনে নিয়েও লোকায়ত পরিসরে স্বচ্ছন্দ এবং সাধ্যমত যত্নবান। সেটা রাজবংশী সমাজের একটা অংশ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে। রাজবংশী সমাজের ঘরবাড়ির চেহারা পাল্টেছে। ডারিঘরের সেই অবস্থান এখন খুঁজেই পাওয়া যাবে না। ঘরোয়া চলাফেরায় এখন অতীতের সেই ছবি নেই। পুরুষ মহিলা সবাই এখন জীবন-জীবিকার স্বার্থে বাইরে ছুটছে। সেরকম কোন বিধিনিষেধ নেই। অবসর এখন উধাও। খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, ক্রিয়া-কর্ম, বিনোদন থেকে পূজা-অর্চনা লোকায়ত আচার-সংস্কার সবেতেই এখন পরিবর্তন এসেছে। বর্ণহিন্দু সমাজের অনেক কিছুই তারা গ্রহণ করেছেন পরিস্থিতির চাপে। বর্ণহিন্দুদের পূজা-অর্চনায় এখন রাজবংশীরা সমানভাবে অংশ নেন। লক্ষ্মীপূজার রেওয়াজ এখন রাজবংশী সমাজে সংযোজিত হয়েছে। শারদীয়া দুর্গোৎসব এখন ভাণ্ডানী দেবীর বিকল্প হয়ে রাজবংশী সমাজে গৃহীত। যদিও ভাণ্ডানী দেবীর পূজা ময়নাগুড়ি (জলপাইগুড়ি জেলা), কামাখ্যাগুড়ি (আলিপুরদুয়ার পূর্বাংশ) কিংবা কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার কিছু জায়গায় সম্পন্ন হয়। সরস্বতী পূজাও নয়া সংযোজন। যাত্রা পূজা, যা ছিল সরস্বতী পূজার নামান্তর তার পরিসর কমেছে। খুব কম পরিবারেই এখন যাত্রা পূজা করে। স্বাভাবিকভাবে গবাদি পশুর পরিচর্যা কিংবা হাল যাত্রার রেওয়াজও হারিয়ে যাওয়ার পথে। জামাইষষ্ঠীর মত অনুষ্ঠানও বর্ণহিন্দুদের সংস্পর্শেই আজকে রাজবংশী সমাজে অন্তর্ভুক্ত। বরং এখন অষ্টমঙ্গলার বিষয়টি গৌণ হয়েছে। দলবেঁধে কন্যা পক্ষের বাড়ির লোকের যাওয়ার ছবি এখন নস্টালজিক মাত্র। এমনকী দেশীয় বাজনা পার্টির (সানাই, কড়কা, বাঁশি সহ) সংখ্যা এখন কমেই গেছে। সানাই-র করুণ সুর এখন রাজবংশী মানুষের স্মৃতির কোঠায়। বিয়ের শুরুতে মাড়েয়া গানের আসরও আর সেভাবে বসে না, নিয়ম রক্ষার্থে পূজা-অর্চনা কিংবা নমঃ নমঃ করে অল্পক্ষণের

আসর বসানো হয়। অন্নপ্রাশন কিংবা নামকরণের পুরোনো ঐতিহ্য আর নেই। এমনকী নামকরণের ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দুদের প্রভাব লক্ষণীয়। আগের মত বস্তুভিত্তিক কিংবা সময়ভিত্তিক নামকরণ এখন করে না রাজবংশী পরিবারগুলো। আগে যেমন বুরুং, ধদলং, বালিয়া কিংবা ফাগুয়া এসব নামের সংস্কার এখন উঠে গেছে। আগে মাসের নামে, ঘটনার নামে কিংবা চেহারা স্বভাব দেখেও নামকরণ করা হত। বিয়েতে 'পানিছিটা' বাপ কিংবা 'মিস্তর' ধরার রীতি শহরাঞ্চলের রাজবংশী ভাবনা থেকে উধাও হয়েছে। যদিও গ্রামাঞ্চলে রাজবংশীরা এখনও এই রীতিটি ধরে রেখেছে। আগে আশীর্বাদের সঙ্গে টাকা পয়সা দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল, এখন দেখা যায় না। বিয়ের গান নাচের পর্ব হারিয়েই গেছে বলা যায়। গুয়াকাটা, নারদের ভার এখন নেই। ভাটাইত/ফারুয়া (ঘটক) কমেছে। কলা পাতায় কিংবা খোলে খাওয়া দাওয়ার রেওয়াজ ক্যাটারার কেড়ে নিয়েছে। দই, চিড়ে খাওয়ার বিষয়টি একেবারে সংক্ষিপ্ত হয়েছে। আগে তো রাজবংশীরা রোজ চিড়ে কুটে খেত। সঙ্গে বহু প্রকারের দই। পানসা দই, ট্যাঙ্গা দই, ঝাল ট্যাঙ্গা দই, ছাচি দই, কাচা দই প্রভৃতি বিচিত্র নামের বিচিত্র স্বাদের দই। বউভাতের সময় গ্রামের পাঁচ দেওয়ানীর মান্যতা প্রদান এখন আর ততটা জরুরি নয়। সর্বোপরি বর্ণহিন্দু ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বিয়েও সম্পন্ন হচ্ছে এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সংযুক্তি ঘটেছে। অধিকারী পুরোহিতের গুরুত্ব কমেছে। তাদের সংখ্যাও কমেছে, গ্রামাঞ্চলে যাও বা আছে শহরাঞ্চলের রাজবংশীরা এখন বলা যায় সম্পূর্ণ ভাবে বর্ণহিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গেই অভ্যস্ত। বিষুয়া পরবের নিয়মকানুন তারা জানেন না, গ্রামাঞ্চলেও সংক্ষিপ্ত হয়েছে। বিষুয়া উপলক্ষে শিকারের পর্বটি অনেকদিন আগেই বর্জিত হয়েছে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনের বিধিনিষেধে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় মাছ মারার বিষয়টি কোথাও কোথাও থাকলেও নিয়ম রক্ষা মাত্র হয়েছে। কিন্তু লোকায়ত সংস্কারের যেমন - কান্দির জল তৈরি, দুপুরে 'ভাজাভুজা' খাওয়া, ২২ প্রকার শাক খাওয়ার যে রীতি অনেকক্ষেত্রেই সেটা নেই। দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে একসঙ্গে শাক রান্না করে খাওয়ার রীতি ছিল। যদিও মালদহ জেলাতে রাজবংশীদের মধ্যে ভাজাভুজা কিংবা শাক খাওয়ার রীতি বহুদিন আগেই লুপ্ত হয়েছে। পান্তাভাত খাওয়ারও রীতি (সংক্রান্তির রাতে রেখে পরের দিন পয়লা বৈশাখে) এখন আর মানা হয় না। মালদহ জেলার রাজবংশীরা 'ছাতু বাড়ান' (চণ্ডীমণ্ডপে ছাতু উৎসর্গ করে দুপুরে খায়) প্রথা অনুসরণ করে। বাস্তুঠাকুরকে পূজার প্রথাটি এখন সংকুচিত। সেইসঙ্গে ঘরের

চালে গাঁজা, বিস্তি, বিষ ঢেকিয়া, ময়না, পানিমুথারি, পাতা গুজে রাখা ইত্যাদি প্রথাও এখন হারাতে বসেছে। তুলসী গাছে 'ঝরা' ঝুলিয়ে দেওয়ার প্রথাটি খুব বেশি দেখা যায় না। তবে অসমের গোয়াল পাড়া জেলার রাজবংশীরা বিষুয়া পরবে এখনও এই আচারগুলি নিষ্ঠাভরে পালন করেন। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার কিংবা দার্জিলিং জেলার রাজবংশী অধ্যুষিত গ্রামে বিষুয়া পরবে নিয়মরক্ষার জন্য সামান্য কিছু অনুষ্ঠান করা হলেও লোকায়ত পরিসরটি অনেকটাই লোকান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এর মূল কারণ জীবন-জীবিকায় ব্যস্ততা সেইসঙ্গে প্রবীণ-প্রবীণাদের সংখ্যা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মাচারের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের সমস্যা এবং অপ্রতুলতা। বর্তমান সময়ে গ্রামাঞ্চলের রাজবংশীরা বিষুয়া পরবকে মাথায় রাখলেও শহরে বসবাসকারী রাজবংশীরা অধিকাংশই স্মৃতির পাতায় রেখে দিয়েছেন। গ্রামাঞ্চলেও বাস্তু ঠাকুরের পূজা দেবার বিষয়টিও এখন সর্বস্তরে পালিত হয় না। অথচ এই বিষুয়া পরবকে ঘিরে চার-পাঁচ দশক আগে রাজবংশীদের বাড়িতে সারাদিনই বহু লোকায়ত আচার-সংস্কার পালিত হত। আজকে বিশ্বায়ন ও ভুবন যুগের সন্ধিক্ষণে রাজবংশী সমাজ জীবনের এই অন্যতম বিষুয়া পরবের গুরুত্ব হারাতে বসেছে। একইভাবে আমাতি (অম্বুবাচী) পরবের বিষয়টিও গুরুত্ব হারাচ্ছে। নিয়ম আচার পালনে শিথিলতা এসেছে। অতীতে রাজবংশী সমাজে এই আমাতি পরবটির সঙ্গে কামাখ্যা বসুমতীর যোগাযোগের ভাবনা সক্রিয় ছিল। বসুমতি রজঃস্বলা অশুচ হিসাবে ঠাকুরবাড়িতে সান্ধ্যপ্রদীপ না দেওয়া, পূজা পার্বণ বন্ধ করা, মাটি না খোঁড়া, চাষবাস বন্ধ রাখা ইত্যাদি পালনীয় কৃত্যাদি ছিল। বর্তমানে ভূমিহীন রাজবংশীদের কাছে এই 'আমাতি' শুধু নামমাত্র। ভূমির সঙ্গে সংযুক্ত রাজবংশীরাও এই লোকায়ত পরিসরটিতে অনুসরণ করেন মাত্র। মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রাজবংশীরা বর্ণহিন্দুদের মতই অম্বুবাচী পালন করেন। এখানে অম্বুবাচী 'আমৈৎ' হিসাবে পরিচিত।[১৫] রাজবংশী মহিলারা উপবাস করে কচুপাতায় দুধ, খৈ, আম ইত্যাদি ফল বাস্তুদেবতা, তুলসী মণ্ডপ অন্যত্র শুদ্ধ জায়গায় রেখে দেন সর্প দেবতার উদ্দেশ্যে। মূলত: এই আমাতি পরবটি প্রজনন শক্তির পূজা এবং তৎসংক্রান্ত ধ্যান ধারণা বটে। রাজবংশী সমাজ এই কৌম পরিসরটিকে অনুসরণ করে। যদিও এখনও ভূমি নির্ভর রাজবংশী সমাজের এই পরবটি আজকে নানাভাবে সংকটাপন্ন। প্রবীণ-প্রবীণারা এই আমাতি বা অম্বুবাচী পরবটিকে অনুসরণ করলেও বর্তমান প্রজন্মের কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। সংকীর্ণ হচ্ছে

লোকায়ত সংস্কৃতির পরিবৃত্তটি। মূলতঃ ভূমি নির্ভর সমাজ সংস্কৃতির পরিবর্তনটাই মুখ্যত দায়ী। রাজবংশীদের অনেকের কাছে এই পরবটি আজকে বাহুল্য মাত্র। রাজবংশী সমাজের কৃষি কৃত্যাদির অনুষ্ঠানগুলি সংক্ষিপ্ত হয়েছে, 'গচিবুনা' অনুষ্ঠানটি করা হলেও বাস্তু ঠাকুরের পূজা ও অন্যান্য কৃত্যাদি সংক্ষিপ্ত হয়েছে। তবে অনুষ্ঠানটি এখনও উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই রাজবংশীরা সম্পন্ন করেন। তামাক চাষের ক্ষেত্রে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশীরা অনেক সময় 'গচিবুনা' পালন করেন। তবে গচিবুনার পূর্বে গ্রাম ঠাকুরের পূজার বিষয়টি অবলুপ্ত হয়েছে। কর্ষিত ভূমিতে নৈবেদ্যর সঙ্গে ৫/৭টি বিছনের থোক রোপণ করে পাট, কলা, কচু, দূর্বা ঘাস রোপণ করে গচিবুনার পর্বটি সম্পন্ন করে গৃহকর্তা। অধিকারীর দরকার পড়ে না। তামাক চাষের ক্ষেত্রে মানকচুর পাতা ও পানের পিক ফেলার রীতি সংস্কার প্রচলিত। আরও বিবিধ নিয়ম থাকলেও সংক্ষিপ্ত হয়েছে। আবার জেলাভিত্তিক সংস্কার রীতিও আলাদা আলাদা হয়েছে। ড. চারুচন্দ্র সান্যালের মতে গচিবুনা আসলে লক্ষ্মী পূজা নয় 'মা ধত্তির' অর্থাৎ ধরিত্রীদেবীর পূজা।[১৬] গচিবুনাকে কেন্দ্র করে রাজবংশীদের কৃত্যাদি এই ভাবনাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। ভূমি নির্বাসনের সাথে সাথে গচিবুনার কলেবরও কমেছে বলা যায়। রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে 'ধানের ফুল আনা' ও 'নয়া খৈ' অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। কিন্তু 'নয়া খৈ' অনুষ্ঠানটির কলেবর কমেছে। আগে নতুন ধানের চাল, চিড়ে প্রথমে নৈবেদ্য হিসাবে ঠাকুর দেবতাকে তুলে দেওয়া হত। ধানের ফুল আনা বা আগ নেওয়া অনুষ্ঠানটি গৃহকর্ত্রী নিষ্ঠা সহকারে করেন। হৈমন্তিক বা হেউতি ধানের ক্ষেত্রে এই রীতি আজও প্রচলিত। তবে মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে যেহেতু বোরো ধানের চাষ বহুল পরিমাণে হয় সেক্ষেত্রে নিয়মাচারে ধানের ফুল আনার বিষয়টি অন্যভাবে পালিত হয়। মনসা, লক্ষ্মী বা বুড়িকালীর উদ্দেশ্যে পূজা প্রদান করে ধানের ফুল আনার নিয়ম রক্ষা করা হয়। থানছিরি দেবীর কাছে ধানের শিষ রাখার নিয়ম মানা হয় না। তবে নবান্ন বা নয়া খৈ হৈমন্তিক বা আমন ধানের ক্ষেত্রেই সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য ধানের ফুল আনা এবং নয়া খৈ অনুষ্ঠান পালন না করে রাজবংশীরা নতুন ধানের ভাত গ্রহণ করেন না। অগ্রহায়ণের শুরুতেই 'নয়া খৈ' অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। অবস্থাপন্ন পরিবারগুলি জাঁকজমকপূর্ণ করে এই 'নয়া খৈ' বা নবান্ন অনুষ্ঠানটি করলেও সংখ্যানুপাতে গরিব প্রান্তীয় রাজবংশীদের অভাবী সংসারে ঠাকুর দেবতাকে উৎসর্গ করেই 'নয়া খৈ' অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। বাইরে লোকজনকে ডেকে খাওয়ানোর সুযোগ থাকে

না। অতীতে পাড়া-প্রতিবেশীকে ডেকে খাওয়ানোর রেওয়াজ ছিল সেইসঙ্গে শেয়াল ঠাকুরের নামেও ভাত তরকারী উৎসর্গ করা হত। এই নিয়মটি কোচবিহার জেলায় এখন পালিত হয় না। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় অতীতে ২১টি কলার ঢোনা (কলার খোল দিয়ে তৈরি ছোট পাত্র বিশেষ) কিংবা পাতায় নৈবেদ্য সাজিয়ে সঙ্গে পুঁটিমাছ পুড়িয়ে বাইরে রেখে দিয়ে আসা হত। আবার কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় রাজবংশী পরিবারগুলি 'নয়া খৈ'র দিন মহাবারিক নামে এক দেবতাকেও নৈবেদ্য দেওয়ার সংস্কার ছিল। সাধারণত ঘরের চালে রেখে দেওয়া হত। অদ্ভুত ভাবে এক্ষেত্রেও পোড়া পুঁটিমাছ কাঠিতে গেঁথে দেওয়ার সংস্কার প্রচলিত ছিল। তবে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় শিয়াল ঠাকুর, নিশা বা মহাবারিক কোন দেবতাকেই পূজা দেওয়ার সংস্কার নেই। ধান কাটাই, মাড়াই এর পর গোলাজাত করার আগে 'বুড়াবুড়ি' অনুষ্ঠানটিও কৃষিকৃত্যাদির মধ্যে পড়ে। শিশুদেরকে দিয়ে এই বুড়াবুড়ি অনুষ্ঠান মাথায় এবং বাংকুয়ায় ধানের আঁটি নিয়ে তিনবার প্রদক্ষিণ করার পর পুকুরের জলে নিক্ষেপ করার এই বুড়াবুড়ির অনুষ্ঠানটি এখন প্রায় লুপ্ত। কারণ আগের মত খোলান বাড়িতে ধান জমিয়ে রেখে অনুষ্ঠানের সুযোগ নেই। প্রতিদিনই কাজ করে বস্তাবন্দি করা হয়। অথচ এই অনুষ্ঠানটির মধ্যে লোকায়ত বিশ্বাস ছিল। ভাবনার কিছু বিষয় সুদূর অতীত সময় থেকে যুক্ত ছিল। সময়ের কালস্রোতে এবং সামাজিক কাঠামো বদলের ফলে এই বুড়াবুড়ি অনুষ্ঠান লুপ্তপ্রায়। আরেকটি বিষয় অতীতে দলবেঁধে কোন গৃহস্থের জমিতে চাষ করার ব্যবস্থা করা হত। খাওয়া দাওয়ার বিনিময়ে যা ছিল যৌথ শ্রমের আদিম রীতি। যা 'হাউলী' নামে পরিচিত। আবার 'গাতা' পদ্ধতিতে একে একে সবার জমি দলবদ্ধভাবে চাষ করার রীতিও প্রচলিত ছিল। এই সমবায় সমন্বয় মানসিকতার বিরাট প্রভাব ছিল রাজবংশী সমাজে। বর্তমানে এই প্রথা উঠে গেছে। আগে এভাবে সবার জমি চাষের বিষয়টি সময়মত সম্পন্ন হত। নিজেদের মধ্যে এক সমৃদ্ধ সম্পর্ক স্থাপিত হত। আরেকটি বিষয় আগে কারো পাঁঠা বা খাসি সবাই মিলে ভাগ করে খাওয়ার রীতি ছিল। যা 'ভাগন' নামে পরিচিত ছিল। সেটাও রাজবংশী সমাজ ভাবনা থেকে অপসৃত হয়েছে। দল বেঁধে মাছ মারার 'বাহো' উৎসবও লুপ্তপ্রায়। আগে শিঙা ফুকিয়ে গ্রামবাসীকে আহ্বান করা হত। রাজবংশী সমাজে মাছ মারাও ছিল একটি উৎসব। হাল আমলে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার সংযোজন ঘটেছে বর্ণহিন্দুদের সংস্পর্শে। মূলত ক্ষেতিলক্ষ্মীর পূজাটি রাজবংশী

সমাজের আদি পূজা। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন বৃহস্পতিবার না হলে কার্তিক মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে ক্ষেতিলক্ষ্মীর পূজা হত।[১৭] বর্ণহিন্দুদের সংস্পর্শে ক্ষেতিলক্ষ্মীর পূজাটি ত্যাগ করে ব্রাহ্মণকে দিয়ে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজাতেই অভ্যস্ত হয়েছে কিছু পরিবার বিশেষ করে শহরাঞ্চলের অধিকাংশ রাজবংশীরাই এটা করছেন। ক্ষেতি লক্ষ্মী পূজার অপর নাম ডাকলক্ষ্মী পূজা। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি অর্থাৎ ডাক সংক্রান্তিতে পূজা দেওয়ার কারণে 'ডাকলক্ষ্মী' হিসাবে পরিচিতি পায়। এইদিনে ক্ষেতে, ঘরে, ঠাকুরের পাটে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের বিশেষ রীতি আছে। ক্ষেতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন 'ভোগা' দেওয়ার সময় চিৎকার করে ছড়া বলা হয় ''আগ শোর হাট, পোকামাকড় দূর হউক।'' মূলত কীটপতঙ্গ দূর করার প্রয়াসে এই প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। অনেকে কাঠিতে করে কাঁঠাল পাতায় সরষে তেলের প্রদীপ বানিয়ে প্রজ্জ্বলন করেন। আবার অনেক রাজবংশী পরিবার এই দিনে আকাশ প্রদীপ জ্বালানো শুরু করেন। এখন আকাশ প্রদীপের প্রচলন কমেছে। তবে এখনও গ্রামে গঞ্জে দেখা যায়। ধান ক্ষেতে 'ভোগা' দেওয়া (ঘিয়ের প্রদীপ) রীতি আজও পালন করে রাজবংশী সমাজ। বিশেষ করে যারা এখনও চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত। আলিপুরদুয়ার জেলার পূর্বাংশে 'চালতা'য় করে পাঁচকোল বাতি দেওয়ার রীতি এই দিনেই প্রচলিত। 'চালতা' রাজবংশী সমাজে 'পাঁচকোল' নামে পরিচিত। বাতি দেওয়ার সময় চিৎকার করে বলা হয় 'সগারে ধান টোনা মোনা, আমার ধান সিদায় সোনা' অর্থাৎ অন্যদের ধান দুর্বল কিন্তু আমার ধান যেন সোনার দানা হয়ে ওঠে। পাঁচকোল বাতি দেওয়ার উদ্দেশ্য ক্ষেতের দুষ্ট পোকামাকড় বিনষ্ট করা। কারণ এই সময় পোকার উপদ্রব শুরু হয়, ধানও তখন হয়ে ওঠার পথে, আলোতে প্রচুর পোকার মৃত্যু হয়। কৃষিকৃত্যাদির এইসব অনুষ্ঠানগুলি আজও রাজবংশীরা পালন করেন কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ সংক্ষিপ্ত হয়েছে। আর এই ধরনের কৃষিকৃত্যাদির অনুষ্ঠানের মধ্যে জড়িয়ে আছে রাজবংশী সমাজের লোকায়ত সংস্কৃতি।

পুষুনা অর্থাৎ পৌষ পার্বণের পর্বটি এখন সংক্ষিপ্ত। অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও সামাজিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের ফলে পুষুনার সেই উন্মাদনা আর নেই। শহরের রাজবংশীরা তো কোন নিয়ম সংস্কারই পালন করেন না। অতীতে চার-পাঁচ দশক আগেও রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে এই পুষুনাকে ঘিরে বেশ কিছু লোকায়ত উৎসব প্রচলিত ছিল। সকালে গরুকে স্নান করিয়ে পিঠা খাওয়ানো, বাস্তু ঠাকুর ও অন্যান্য দেবদেবী উৎসর্গ করে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজ পিঠা খেত।

অধিকারী ব্রাহ্মণ দিয়ে পূজাও করা হত। বহু আগে শিকারের প্রথাও প্রচলিত ছিল। মহাবারিকের (বৌদ্ধিয় রীতি) উদ্দেশ্যেও পিঠা উৎসর্গ করার রীতি রাজবংশীরা একদা অনুসরণ করতেন। বর্তমানে বলা যায় কোন নিয়মই সঠিকভাবে পালন করা হয় না। গিরিজাশংকর রায়ের ভাষায় "উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে কোন প্রকারে প্রথাটি টিকিয়া রহিয়াছে।"[১৮] পৌষ পার্বণের দিন বালকেরা সারারাত জেগে থেকে 'ভ্যাড়া ঘর' পুড়িয়ে স্নান করত। সেদিন বাড়ির গবাদি পশুকে স্নান করিয়ে তাদের গায়ে চালের পিটুলী গুলিয়ে কলাপাতার ডাঁটি দিয়ে গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হত। বর্তমানে গ্রামগঞ্জে কিছু সংস্কার এখনও পালিত হয়। কিন্তু শহরের রাজবংশীরা বর্তমানে কোন সংস্কারের প্রতি বশবর্তী নয়। আর সুযোগও নেই এই অজুহাতে ভুলে থাকেন।

কয়েক দশক আগেও রাজবংশী সমাজে বন্ধুত্ব স্থাপন সূচক নানাবিধ অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। বিয়েতে 'মিস্তর ধরা' গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত আছে। এই মিস্তর ধরার মধ্য দিয়ে সম্পর্কের সম্প্রসারণ ঘটত দুই বন্ধু ও পরিবারের মধ্যে। 'সখা হালা'র মধ্য দিয়ে দুই বন্ধু ও পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হত। আজীবন সেই সম্পর্ক বজায় থাকত। আবার মেয়েদের মধ্যে সখি পাতানো অনুষ্ঠান 'ভাদাভাদি' নামেও পরিচিত। ধর্ম ঠাকুরকে সাক্ষী করে সই পাতানোর বিষয়টি রাজবংশী সমাজে আত্মীয়তা সম্প্রসারণের উদাহরণ। মূলত এই তিন ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্যেই রাজবংশী সমাজের উদারতার ছবিই ধরা পড়ে। যার জন্য রাজবংশী অধ্যুষিত গ্রামে একটি কথা প্রচলিত 'গ্রামের সবাই সবার আত্মীয়', কোন না কোন সম্পর্কে আত্মীয়তার বন্ধন বিস্তৃত হয়েছে। এই সখি পাতানোকে ঘিরে কোচবিহার জেলার দিনহাটার নগরভাংনী গ্রামে চৈত্র মাসের বারুনী তিথিতে 'সখীর মেলা' বসে। এখনও সেখানে সই পাতানোর ছবি দেখা যায়। অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গেও অনেকে এই সই পাতানোয় আবদ্ধ হয়। এই অনুষ্ঠানগুলি রাজবংশী সমাজে এক বিশেষ সামাজিক গুরুত্ব বহন করত। বর্তমান বিশ্বায়িত সময়ে এইসব সম্পর্কের গুরুত্ব অনেকটাই হারিয়েছে। রাজবংশী সমাজের মধ্যে এই লোকায়ত সম্পর্কের কিছু বিষয় এখনও লেগে আছে বইকি। তবে সেটা কতদিন, সেটাই প্রশ্নের। কারণ ইতিমধ্যে এই সম্পর্কগুলির গুরুত্ব যথেষ্ট কমেছে।

লোকায়ত সংস্কারে 'বট-পাখিরীর বিয়া' কিংবা 'জিগা গাছের সঙ্গে সই পাতানো'র বিষয়টি এখন বিশেষ নজরে আসে না। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলায় অপুত্রক ব্যক্তি

বট-পাকুড়ের বিয়ের আয়োজন করতেন। অনুষ্ঠান করেই অধিকারী পুরোহিত দিয়ে এই বিয়ে সম্পন্ন হত, এই প্রথা বহু প্রাচীনকালের বৃক্ষ ভাবনার পরিচায়ক। জিগা গাছের সঙ্গে সই পাতানোও বিষয়টি বৃক্ষ ভাবনারই আরেকটি দৃষ্টান্ত। মূলত: মৃতবৎস্যা নারী সন্তান কামনায় এই জিগা গাছকে সই পাতানোর সংস্কারে আবদ্ধ হন। গাছটির সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হতে। জিগা গাছটি এখানে নারী হিসাবে প্রতিপন্ন হত। জিগা গাছ যেহেতু দীর্ঘজীবী সেখানে সন্তানের বেঁচে থাকাকে প্রাধান্য দিয়ে জিগা গাছ রাজবংশী সমাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের লোকায়ত সম্পর্কগুলির প্রভাব এখন কমেছে। সচরাচর 'বট-পাখিরীর বিয়া' কিংবা 'জিগা গাছের সঙ্গে সই পাতানো'র বিষয়টি নজরে আসে না। তবে কয়েক দশক আগেও এই বিষয়গুলি প্রায়শই নজরে আসত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রাজবংশী সমাজের প্রাচীন ভাবনাগুলিরও অবলুপ্তি ঘটছে এটা যেমন বলা হয় তেমনি লোকায়ত সংস্কৃতির পরিসরটিও ছোট হচ্ছে।

মালদহ জেলা গাঙ্গেয় সভ্যতার অধিকারী বলে এই অঞ্চলের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের সংস্কৃতির মধ্যে অরাজবংশী বর্ণহিন্দুদের আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব পড়েছে এবং সেটা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও কিছুটা সম্প্রসারিত হয়েছে। আবার অপরদিকে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের সভ্যতা সংস্কৃতি মূলত কোচবিহারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং জেলাগুলিতে এখন রাজবংশী আচার অনুষ্ঠানের সমতা দেখা যায়।[১৯]

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহে রাজবংশীদের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। বলা যেতে পারে এই কয়েকটি জেলার রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের প্রায় সবাই এখন বৈষ্ণব ভাবাপন্ন। বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজের রাজবংশীরা। শহরের ভিন্ন ভিন্ন পেশায় যুক্ত থাকায় রাজবংশী মানুষজন বাইরে থাকলেও তারা সংস্কৃতিগত দিক থেকে বর্ণহিন্দুদেরই কাছাকাছি। ফলত: উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের লোকায়ত সংস্কৃতির পরিসরটিও দ্রুত পরিবর্তমান। অনেক কিছুই লোকান্তরিত। আবার পালিত হলেও নিয়ম সংস্কারের পরিসরটি একেবারে সংক্ষিপ্ত হয়েছে।

সমীক্ষায় উঠে আসে কৃষিকৃত্যাদির অনেক অনুষ্ঠানই এখন পালিত হয় না। এখন অবশ্য শস্য বৈচিত্র্যের ফলে চাষবাসের প্রকৃতি পালটে গেছে, শুধুমাত্র হৈমন্তিক (হেউতি) চাষাবাদে

সীমাবদ্ধ নয়। গচিবুনা-গোচরপনা, ক্ষেত বাড়ানো (নতুন ধানের ভাত ও অন্যান্য উপকরণ পাথার বাড়ি অর্থাৎ বাইরে উৎসর্গ) এখন নেই। নতুন ধানকে ঘিরে ধানের ফুল আনা, বুড়াবুড়ি অনুষ্ঠানও নেই। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় এই বিষয়টি লক্ষণীয়। দু'একটি পরিবারের মধ্যে কিছু নিয়ম সংস্কার থাকলেও অতীতে খোজাগর (কোজাগরি) মাগন বহুল প্রচলিত ছিল। ছেলেরা ছুক্রি সেজে নাচগান করত বাড়ি বাড়ি, মাগন তোলা হত। এখন যা নজরে আসে না। 'হালুয়া হালুয়ানীর গান'ও বিলুপ্তির পথে। খন গান এখন সরকারি প্রচারেই বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। প্রেম পিরিতি কিংবা সামাজিক ঘটনায় সীমাবদ্ধ নয়। উত্তর দিনাজপুর জেলায় আগে বাউল এর প্রভাব ছিল না। ছিল কিছু গেরুয়া পোষাক পরিহিত সাধু-বোষ্টম মানুষ বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেহতত্ত্ব, মনঃশিক্ষার গান শুনিয়ে বেরাতো। সাধুমেলা হত। সেটাই কয়েক দশকে বাউল সমাবেশে পরিণত হয়েছে। হারিয়ে গেছে দেহতত্ত্ব, মনঃশিক্ষা গানের ভাণ্ডার। মূলত দেশীয়া তথা রাজবংশী সমাজেই এইসব গান বহুল প্রচলিত। অবশ্য অন্যান্য জেলা আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাতেও এইসব গানের ব্যাপক প্রচার ছিল। ময়নাগুড়ি এলাকায় তন্ত্র সাধনার গান হিসাবে গানের প্রসারও কমেছে। অতীতে ধূপগুড়ি, রাজগঞ্জ, ময়নাগুড়ি (জলপাইগুড়ি জেলা) এলাকায় গানের বহুল প্রচার ছিল। অতীতে পূজা-পার্বণেও এই গানগুলি গাওয়া হত। পার্শ্ববর্তী দার্জিলিং জেলার লাহাংকারী গানের ধারা এখনও বজায় আছে। তবে প্রতিবন্ধকতা অনেক। কারণ অনুষ্ঠান বা গানের আসরের সংখ্যা কমেছে। বেসরকারি উদ্যোগে আগের মত অনুষ্ঠানের আয়োজন এখন হয়না। কারণ আগের মত পৃষ্ঠপোষকের অভাব রাজবংশী সমাজে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় কুশমণ্ডি, তপন এলাকায় মনসামঙ্গলের আসর বসে বিভিন্ন বাড়িতে। সত্যপীরের গানের আসরও বসে, লক্ষ্মীর গানও প্রচলিত। তবে সবেতেই পরিবর্তনের ধারা। ভাষা, ভঙ্গীমায় পোষাক-আশাকের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে। দর্শক শ্রোতারও সংখ্যাটা কমেছে। তাদের রুচিও পাল্টেছে। এটা বলা যায় ধারাগুলি হারায়নি। দিনাজপুরের জনবিন্যাস ও অন্যান্য প্রেক্ষিতে আজও এই ধারাটি রাজবংশী সমাজ ধরে রেখেছে।

বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় দেশীয়া, পলিয়া কিংবা কোচদের মধ্যে এখন তেমন বিভেদ নেই। অতীতে গোষ্ঠী মানসিকতা থাকলেও বর্তমানে সবাই মেনে

নিয়েছে সমস্ত গোষ্ঠীই বৃহত্তর রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজেরই অংশ। আবার বর্ণহিন্দুদের অনেক কিছুই গ্রহণ করে নিয়েছে। সেইসঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় যে বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতিগত বিশ্বাস এবং পালনীয় আচার-সংস্কারের মধ্যে যে ঐক্যগত সাদৃশ্য সেখানে বর্তমানে আলাদা করে ভাববার অবকাশ কমেছে। তবুও সামান্য কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজস্ব আচার সংস্কারগুলি পালন করার চেষ্টা করে। কিন্তু বৈষ্ণবায়ন অনেক কিছুকেই মুছে দিয়েছে। মালদহ জেলার গাজল, হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার সবাই বৃহত্তর রাজবংশী ক্ষত্রিয় মানুষ। একলাখি পাণ্ডুয়া অঞ্চলের রাজবংশীদের মধ্যে দেহবাদী, তান্ত্রিকতার ব্যাপক প্রসার ছিল। আজকে সেই ধারা বৈষ্ণবায়নে পর্যবসিত। বিয়ের পরের দিন থেকে তুলসীর মালা গলায় ধারণ করে। আবার বিয়েতে চণ্ডী পূজার প্রচলন আজও আছে। অদ্ভুত বৈচিত্র্য, সেখানে কোন বিরোধ তৈরি হয়নি। আবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকে পুরোহিত দিয়েই সমস্ত পূজা-অর্চনার কাজ করে রাজবংশী সমাজের দেশীয়া, পলিয়ারা। কোচ গোষ্ঠীর মধ্যে যেমন মনসামঙ্গলের প্রভাব তেমনি দেশিয়া, পলিয়াদের মধ্যেও দেখা যায়। গঙ্গারামপুর, হিলি, বালুরঘাট এলাকায় পলিয়ারাও মনসামঙ্গলের অনুসারী। আসলে বৃহত্তর রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে বহু শাখাপ্রশাখার সম্মীলন হয়েছে যুগ ও সময়ের স্রোতধারায়। বৈষ্ণবায়ন এই কয়েকটি জেলার রাজবংশী লোকায়ত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মনস্কতা এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও অনেক উদারীকরণ ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবে বর্ণহিন্দুদের প্রভাব বেড়েছে। রাজবংশী লোকায়ত সংস্কৃতির পরিসরটি সংকুচিত হয়েছে।

মালদহ ও দিনাজপুর (উত্তর ও দক্ষিণ) দেশীয়া ও পলিয়াদের মধ্যে নিয়ম আচার ও সংস্কারের মধ্যে একটা শিথিলতা এসেছে। ফলত: সবাই এখন বৃহত্তর রাজবংশী সমাজেরই অংশ। অনেকে উপবীত ধারণ করলেও বৈষ্ণব ভাবাবেগে এখন সবাই তুলসীর মালা ধারণ করেন বিয়ের পরেই। অতীতের অনেক কিছুই এখন বিবর্তমান। আবার বর্ণহিন্দুদের প্রভাবে অনেক কিছুই গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে এই জেলাগুলির রাজবংশী সমাজ এখন বৃহত্তর হিন্দুধর্মের অংশ। বরং বলা যেতে পারে মালদহ জেলার রাজবংশী সমাজ অনেক বেশি গাঙ্গেয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবাহে পরিপুষ্ট। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রাজবংশী সমাজের লোকায়ত সংস্কৃতির পরিসরটিও স্বাভাবিকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। সেখানে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির

সাংস্কৃতিক বিবর্তন কিংবা লোকায়ত অঙ্গন কোচবিহার জেলার রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত এবং আবর্তিত হয়। দার্জিলিং জেলার তন্ত্রভাবনার সংকোচন ঘটেছে। জলপাইগুড়ি জেলার প্রান্তবর্তী ময়নাগুড়ি এলাকার শৈব ভাবনার পাশাপাশি তন্ত্রসাধনা সহ বৌদ্ধিয় সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে বিভিন্ন লোকায়ত দেবদেবীর মধ্যে। যেখানে ভোট-তিব্বতি প্রভাবও লক্ষণীয়। সেটা আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। কুমারগ্রাম দুয়ার এলাকার রাজাঠাকুর কিংবা গাও বুড়ার পূজায় এখন শূকর বলি দেওয়া হয় না। তবে নিশান, শালু কাপড় বেঁধে দিয়েই মানত পূরণ করার রীতি আজও বর্তমান।

আবার মনসা বিষহরিকে হাঁস বলি দেওয়ার প্রথাও এই এলাকায় আর বর্তমান নেই। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় হাঁস বলি দেওয়ার রীতি আজও প্রচলিত। অবশ্য এটা সবার মধ্যে নেই — বিশেষ করে তথাকথিত কোচ-রাজবংশীরাই এটা করে। মুখোশকে বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতীক হিসাবে পূজার রীতি উত্তর দিনাজপুরের তপন, কুশমণ্ডি এলাকায় প্রচলিত। মুখোশ নৃত্যও অতীতে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলার ভুটান সন্নিহিত এলাকায় প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে নেই। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে মুখোশ নৃত্যের বিভিন্ন আঙ্গিক আজও বর্তমান। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলার পূর্বাংশে কামরূপী ব্রাহ্মণের অগ্রাধিকার থাকলেও উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলাতে রাজবংশীরা বর্ণহিন্দু ব্রাহ্মণ দ্বারাই সমস্ত ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করেন। বর্ণহিন্দু ব্রাহ্মণরা গৃহীত হয়েছে সম্পূর্ণভাবে। প্রান্তীয় জেলা আলিপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলাতে এখন দেশীয় কামরূপী মৈথিলী ব্রাহ্মণদের অগ্রাধিকার রাজবংশী সমাজে। চণ্ডী পূজার প্রচলন উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলাতে যথেষ্টই কিন্তু আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার কিংবা জলপাইগুড়ি জেলাতে কম। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকে কোচ-রাজবংশীরা অধিকারীর বদলে পুরোহিত দিয়ে লৌকিক সেবা নৈবেদ্যর কাজ সম্পন্ন করে। তবে উল্লেখ্য প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গে যেমন কামরূপী ব্রাহ্মণের সংখ্যা কমেছে তেমনি বর্ণহিন্দুদের প্রভাব বৃদ্ধি পেলেও অধিকারী পুরোহিতরা বাড়ির সেবা নৈবেদ্যর কাজে যুক্ত। তাছাড়া রাজবংশী সমাজেও যখন লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজার প্রচলন শুরু হয়েছে স্বাভাবিকভাবে বর্ণহিন্দুদের অনুগমন ঘটেছে। তবে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহে বৈষ্ণবীয় প্রভাবে লোকায়ত সংস্কৃতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। দেশীয়দের মধ্যে

মাটির মূর্তির প্রচলন বেশি ঘটেছে। কালী, মনসা, বাস্তুদেবতা, চামুণ্ডা, লক্ষ্মী ঠাকুর, হনুমান, কোরাকুরী, হুদোম দ্যাও ইত্যাদির পূজা কয়েক দশক আগে হলেও বর্তমানে বিশেষ প্রচলিত নয়। অনেক দেবদেবী লোকান্তরের পথে। দক্ষিণ দিনাজপুরে বুড়ি ঠাকুরের পূজা গ্রামঠাকুরের পূজার মতই রাজবংশী সমাজের কাছে এখনও গুরুত্বপূর্ণ। মুখোশই দেবীর প্রতীক হিসাবে পূজিত হয়। মালদহ জেলার বামনগোলা থানার নিমডাঙ্গা, নালাগোলা, হবিরপুর থানার আতলা, দোতনা, সিঙ্গাবাদ, গাজল থানার রাণীগঞ্জ, ওল্ড মালদার বানিয়া, নবাবগঞ্জ ও কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জ, সুকুনাপুর, চকবাহাদুর, চাঁচল থানার দৈভাণ্ডা ইত্যাদি অঞ্চলে রাজবংশী সম্প্রদায়ের অধিক সংখ্যায় বসবাস। অতীতে বিভিন্ন ধরনের লৌকিক সংস্কৃতি ও লোকাচারের উৎসব অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালিত হত। পূজা-পার্বণ, লৌকিক ছড়া, প্রথা-প্রবাদ-প্রবচন, রূপকথা এসবের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের চালচিত্র ফুটে উঠত। এছাড়াও ছিল গম্ভীরা, আলকাপ, লবকুশ, খন বা মিশা ও গ্রামীণ যাত্রা গান। এর মাধ্যমে সামাজিক অন্যায় অবিচারের কথা, নীতিশিক্ষা ও লোকশিক্ষা প্রচারিত হত। স্বাধীনোত্তর সময়কাল থেকে এই চিরায়ত ছবি দ্রুত পালটে যেতে থাকে। গাঙ্গেয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও বর্ণহিন্দুদের প্রভাব যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে রাজবংশী সমাজ সংকটাপন্ন হয়। আচার - সংস্কার থেকে পূজা-পার্বণ সবেতেই পরিবর্তনের হাওয়া লাগে। অর্থনৈতিক দিক থেকেও পিছিয়ে পড়তে থাকে ফলে সামগ্রিকভাবে লোকায়ত সংস্কৃতির পরিসরটি সংকুচিত হয়।

দেশীয়া, পলিয়াদের মধ্যে দেশীয়াদের নিয়ম রীতি বেশি ছিল। আবার পলিয়াদের মধ্যে নিজস্ব কিছু রীতি সংস্কারে সমাজ পরিচালিত ছিলেন। পলিয়াদের মধ্যে সম্মানীয় কিছু ব্যক্তি 'পোচাম' এবং 'মোহত' নামে পরিচিত ছিল। তারা 'দশ' হিসাবে সমাজের রীতি ব্যবস্থা নির্ধারণ করত। আবার ১২ অথবা ১৮টি 'পোচাম' মিলে তৈরি হত 'পটি'। এই 'পটি' পলিয়াদের সামগ্রিক ভালোমন্দের বিচার করত। প্রয়োজনে পোচামদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পলিয়া সমাজে দিত। বর্তমানে এই ব্যবস্থা নেই, এখন পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার মাধ্যমেই সবকিছু নির্ধারিত হয়। দেশীয়া, পলিয়া সবাই এক।

দেশীয়াদের বিয়েতে আগে 'কলাতলা' নামে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনুষ্ঠান ছিল। জলপূর্ণ কলসী ও কলাগাছ দিয়ে 'কন্যামন' ও বরামন' ইত্যাদি সাজানো হত। বরাতীরা (যে চারজন

সধবা স্ত্রী ও বরের পরিচর্যার দায়িত্ব থাকে) বিয়ের অন্যান্য আচার-সংস্কারগুলি পালন করত। এখন সেইসব অনুষ্ঠান অনেক সরলীকৃত হয়েছে বর্ণহিন্দুদের নানা অনুষ্ঠানের প্রভাবে। গানের বিষয়টিও এখন সংকুচিত হয়েছে। অতীতের বাল্য বিবাহের রীতিটিও এখন প্রচলিত নয়।

বৌদ্ধ, হিন্দু ও পাঠান শাসকরা গৌড়কে রাজধানী হিসাবে ব্যবহার করার ফলে বিভিন্নমুখী সংস্কৃতির ধারাপ্রবাহ গড়ে ওঠে। সুলতান আমলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ঘটে। ষোড়শ শতকের গোড়ায় (১৫১৪-১৫) খ্রিস্টাব্দে চৈতন্যদেবও আসেন। স্বাভাবিকভাবে ধর্মের বহুমুখী ধারায় লোকায়ত সংস্কৃতিও বৈচিত্র্যময়। মালদহ জেলায় শিবের লৌকিক রূপের ছড়াছড়ি। তার মধ্যে গম্ভীরা অন্যতম। উর্বরতা কৃষির দেবতা হিসাবে লোকবৃত্তে শিবের অবস্থান। সেটা শুধু রাজবংশী সমাজে নয়, অন্যান্য জনগোষ্ঠীর কাছেও সমানভাবে মান্য। চৈত্র সংক্রান্তির নানাবিধ লোকাচার (গোরুর স্নান, পূজা, ছাতু সংক্রান্তি, বিশুয়া, দর্পণ সংক্রান্তি) সাথে গম্ভীরার মহা সমারোহ শুরু হয়। সোনা রায় তো শিবেরই প্রকারভেদ, সোনা রায়ের পূজা হারিয়ে যায়নি গৌড় এলাকা থেকে। এতদঞ্চলে সাঁওতালদের মধ্যেও শিবপূজা প্রচলিত। এরা মনসা পূজা করেন কচুপাতায় দুধ ও ঘি দিয়ে। মনসা বিষহরির পূজায় রাজবংশীরা হাঁস বলি দেয়। বিয়ে ও কোন শুভানুষ্ঠানের আগে মনসা পূজার রীতি রাজবংশীরা অনুসরণ করে তবে চণ্ডী পূজারও ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। অতীতে এই চণ্ডী পূজা রাজবংশীদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত না থাকলেও বিগত কয়েক দশকে চণ্ডী পূজার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। শুধু মানিক দত্তের জন্মস্থান বলেই নয়, রাজবংশী সমাজে চণ্ডী পূজার প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে আরও কিছু কারণ আছে। তার মধ্যে জাতি অন্বেষণে কোচ মহারাজা বিশ্বসিংহের চণ্ডী পূজার বিষয়টি নিয়ে ভাবার অবকাশ আছে।

পঞ্চদশ শতকে দিনাজপুরের রাজা যদু, ইসলাম ধর্মগ্রহণ করায় রাজবংশী সমাজের একটা বৃহৎ অংশ ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। তা সত্ত্বেও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রাজবংশী মানুষের বসবাস প্রায় সব গ্রামেই কম বেশি। বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রায় ত্রিশ শতাংশ গ্রামে শুধু রাজবংশী জাতি পরিচয়ের মানুষ বসবাস করেন। ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া সুলতান আমলে শুরু হয়। বহু রাজবংশী মানুষ বৌদ্ধ ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। আবার রাজবংশী জাতির মধ্যেও বিভিন্ন জাতির আগমন ঘটে। রাজবংশী বর্তমানে হিন্দু কিন্তু সংস্কৃতির দিক থেকে মিশ্র। কেউ শৈব্য, কেউ বৈষ্ণব, জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য প্রভাব যেমন দৃশ্যমান তেমনি আদিম সংস্কৃতির

নিদর্শনও খুঁজে পায়। মৈথিলী-মাগধি সংস্কৃতিও প্রভাবিত করেছে। স্বাভাবিকভাবে লৌকিক দেবদেবীর মধ্যেও বহু সংস্কৃতির যেমন সমন্বয় ঘটেছে তেমনি প্রাকৃতিক বিভিন্ন শক্তিকে আশ্রয় করেও দেবদেবীর সংযুক্তি ঘটেছে রাজবংশী সমাজ জীবনে। শিব প্রধান দেবতা হলেও কালির বহু প্রকারভেদ বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পূজিত হয়। যেমন - বিন্দ্যেশ্বরী দেবী (পতিরাম গ্রাম, বালুরঘাট) পূজায় লাল শাড়িই প্রধান উপাচার, হিলির চামুণ্ডা দেবী নিম কাঠে মুখায়বে পূজিত হয়। ডাকরা চণ্ডী, দাপট কালী শিব বিগ্রহের উপর মায়ের মুখোশ পড়িয়ে মাতৃ পূজা সম্পন্ন হয়। বোল্লা কালী দক্ষিণ দিনাজপুরের বহু প্রাচীন পূজা। এছাড়াও বাশুলি কালী, বসন্ত কালী, মাশান কালী, সুরকালী আরও বহুরূপে কালীর পূজা প্রচলিত। দক্ষিণ দিনাজপুরে 'বুড়িমা' খুব বিখ্যাত দেবী। তাকে ঘিরে গাছের তলায় বিভিন্ন দেবতার আশ্রয়, অনেকটা গ্রামঠাকুরের মত। হরিরামপুর থানার বৈরাটের বুড়ি অনেকগুলি জিহ্বা বের করে কালী মুখাদেবী বহালে পূজিত হয়। এছাড়াও ছাঁচিকা দেবী, বাঘেরাই চণ্ডী, চামার কালী, উত্তরে কালী, উগুলিয়া চণ্ডী বিভিন্ন নামের লৌকিক দেবদেবী নিয়েই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার লোকায়ত সংস্কৃতি বিশ্বায়নের ভুবনগ্রামে অনেক দেবদেবীর গুরুত্ব হ্রাস পেলেও এখনও কিছু গ্রামগঞ্জে অস্তিত্ব আছে। তবে পরিবর্তন ও নতুন ভাবনার প্রভাব তো পড়েছে। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। উত্তর দিনাজপুর জেলায় দেশীয়া, পলিয়া রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজেও লৌকিক দেবদেবীর ছড়াছড়ি। লোকায়ত ভুবনে এই দেবদেবীর আচার-বিচার, সমাজ ও ধর্মীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। বৃহত্তর রাজবংশী সমাজ জীবনের সঙ্গে বলা যায় অতিরিক্ত কিছু লৌকিক দেবদেবীর অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে সময় পরিবেশকে প্রাধান্য দিয়ে। যেমন - গো-চুমার সঙ্গে দাগা পূজা। মহিষকে স্নান করিয়ে মাথায় তেল সিঁদুর মাখিয়ে পূজা করার রীতি প্রচলিত। দলছিটা, কাঁঠাল পাতায় ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালানো কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠান আশ্বিনের শেষ কিংবা কার্তিক মাসের প্রথমে করা হয়। এই পূজা শেষে একটি হাঁসের মাথা ছিড়ে রক্ত ছিটিয়ে দেওয়া হয় ধানের গোলায়। ছেঁপুয়ান অর্থাৎ কাকতাড়ুয়াও পূজা পায় রাজবংশী সমাজের কাছে। কার্তিক মাসের অমাবস্যায় এখানে জলমাঙ্গা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ভিন্ন এক অনুষ্ঠান হতে দেখা যায়। অতিবৃষ্টির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশায় রাজবংশীরা 'হরি লাঙ্গল কোদাল খিল চুনি চোখাই' অনুষ্ঠান। অতিবৃষ্টির হাত থেকে ফসল বাঁচানোর উদ্দেশ্যে রাত্রে পুরুষেরা উলঙ্গ হয়ে লাঙ্গল, কোদাল

খিলে তেল সিঁদুর লাগিয়ে গোবরের ঢিপির সামনে পূজা করে। কালীপূজার রাত্রে কৃষি পূজাও অনুষ্ঠিত হয় লাঙ্গল আর কাদা দিয়ে। শিশুর সুস্থতা ও মঙ্গলার্থে হয় ভেদাই ঠাকুরের পূজা। ‘মেথিনী দ্যাও’র পূজায় রান্নাঘরে বাড়ির মালিক সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে রান্না করা খাবারকে উপাচার হিসাবে উৎসর্গ করে। নবান্নে হয় মহামারী ঠাকুরের পূজা। দুয়ারী কুয়ারীও রান্নাঘরের দেবতা, দরজায় তার অবস্থান। অনেক বাড়িতে দরজায় দুয়ারী ঠাকুরের বেদীও দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামঠাকুর, বিষহরি দেবী, সইত্যপীর, বাবাঠাকুরের পূজাগুলি এখনও কলেবরে হলেও অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর অনেকগুলি আজকে অন্তরালে। তবে গ্রামীণ এলাকার রাজবংশীরা এখন পাল পরবে এইসব দেবদেবীকে স্মরণ করে সামান্য দুধ কলা দিয়ে কিংবা কিছু আচার সংস্কার পালন করে। লোকায়ত ভুবনের অনেক অনুষঙ্গই আজকে অনেক কিছুর গ্রাসে হারিয়ে গেলেও এখনও কিছু কিছু আছে।

মালদহ জেলাতেও বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীকে ঘিরে রাজবংশী সমাজ জীবন আবর্তিত হয়। চণ্ডী, বিষহরি, মনসা তো আছেই গম্ভীরাকে ঘিরে নীলকণ্ঠ শিবের আরাধনা মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়। এছাড়াও কালীর কিছু প্রকারভেদ আছে। তবে মালদহ জেলায় রাজবংশী সমাজের পূজা-পার্বণ ও লোকায়ত ভুবন অনেকটাই বিক্ষিপ্ত। শুধুমাত্র গাঙ্গেয় সভ্যতা, বর্ণহিন্দু সংস্কৃতি নয় পার্শ্ববর্তী রাজ্যের প্রভাবও অনেকাংশে প্রভাবিত করেছে। ফলতঃ রাজবংশী লোকায়ত সংস্কৃতির অঙ্গনে লৌকিক দেবদেবীর পূজা-অর্চনাও অন্তর্লীন হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে বিস্তীর্ণ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের লোকায়ত সংস্কৃতির বৃত্তটি বিবর্তিত, পরিবর্তিত কিংবা সংকুচিত হলেও এখনও লোকায়ত পরিসরটি ছোট নয়। অনেক কিছুর অভাব ঘটলেও অতীতের লোকায়ত বৃত্তেই রাজবংশীরা নিজেদেরকে স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ মনে করেন। যার মধ্যেই লুকিয়ে আছে আদি-অনাদিকালের কৌম ভাব ও মানসিকতা।

• ধর্মীয় সংস্কৃতি

ধর্ম মানবজীবন ও গোষ্ঠীজীবনে অপরিহার্য একটি বিষয়। কারণ আচার-সংস্কার, বিশ্বাস, রীতিনীতির সবকিছুই গড়ে ওঠে ধর্মীয় বোধ ও ভাবনা থেকে। আবার ধর্মবোধ ও বিশ্বাসের বিভিন্নতার জন্য একই ভূখণ্ডে পাশাপাশি বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনাচারণে পার্থক্য দেখা যায়। রাজবংশী সমাজ সুদীর্ঘকাল বিভিন্ন জনজাতির সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস এবং বর্ণহিন্দুদের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আধার করে রেখেছেন। অনেক বাধা-বিপত্তি, যোগাযোগের প্রসার, শিক্ষা, আধুনিকতার মিশ্র সংস্কার, বৈদ্যুতিন মাধ্যমের গতি সমস্ত কিছুকে অধিগ্রহণ করেও নিজস্ব ঐতিহ্য ধর্ম বিশ্বাসকে অনেকাংশে ধারণ করে রেখেছেন। পরিবর্তনকে সাপেক্ষ করেও বিবর্তনের উত্তরাধিকারে নিজস্ব ধর্মাচরণের আচার সংস্কারে তাই এখনও ব্যতিক্রমী। এখনও তাই আদি জনজাতির চিহ্ন বৈশিষ্ট্য অনেকক্ষেত্রে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।

কোচ-রাজবংশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সমন্বিত জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ। রাজ আখ্যান থেকে কথিত বিশ্বসিংহ নিজে অভিষেকের সময়ে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন এবং শিব পার্বতীর উপাসক হন। তিনি দেবী দুর্গাপূজা সম্পন্ন করে কোচ-রাজ্যে হিন্দুদের বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সব মন্দিরে পূজার জন্য মিথিলা থেকে ব্রাহ্মণ নিয়ে আসেন।[২০] বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণও সিংহাসনে আরোহন করেই পিতার অনুসরণে শৈবধর্মে দীক্ষা নেন। নরনারায়ণ হিন্দুধর্মের ও সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে অহমদের সঙ্গে যুদ্ধেও অবতীর্ণ হন।[২১] বলা যায় নরনারায়ণ হিন্দুধর্ম প্রসারের গতিকে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। বৃহৎ রাজবংশ তার ধর্মনীতিকে অনুসরণ করে। রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীদের পুরাণ ও হিন্দুধর্ম শাস্ত্রাদি নির্দেশিত জাতপাতের ভাগাভাগি মেনে চলার এবং সেই নির্দেশমত নিজ নিজ কর্তব্য এবং আচরণবিধি অনুসরণ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।[২২]

মহারাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে রাজ্যের উত্তরার্ধে উপজাতীয় ধর্মাচার-অনুষ্ঠান প্রধান ছিল অপরদিকে দক্ষিণার্ধে হিন্দুধর্মীয় পূজা ও আচার এত প্রসারিত ছিল যে সেখানে ব্রাহ্মণকে পুরোহিতের পদে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল। ফলে রাজশক্তির প্রশ্রয় এবং প্রবল সমর্থন পাওয়া সত্ত্বেও কোচ রাজত্বের প্রথমাংশে উপজাতীয় অধিবাসীগণের হিন্দুকরণ (Hinduization)

প্রক্রিয়া মাত্র অর্ধপথে অগ্রসর হয়েছিল।[২৩] এদের মধ্যে যারা প্রায় সম্পূর্ণভাবে হিন্দু সামাজিক ব্যবস্থা ও আচার ব্যবহার গ্রহণ করেছিলেন, তারা কোচদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক বজায় না রেখে নিজেদের রাজবংশী হিসাবে পরিচয় দিয়ে স্বতন্ত্র জাতিসত্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। মহারাজা নরনারায়ণের আমলে যারা এই রাজবংশী নাম ধারণ করেছিলেন তাদের জন্য অনেক মন্দির নির্মিত হয়েছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আরও অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৪] তবে বহু মন্দির নির্মিত হলেও পূর্বে রাজবংশীদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বাঙালি তথা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পৌরহিত্য করার ঘটনা বিরল ছিল।[২৫] অর্থাৎ রাজবংশী সমাজে হিন্দুধর্মের প্রসার রাজানুকূল্যে ঘটানোর প্রয়াস হলেও রাজবংশী সমাজ তাদের লোকায়ত ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি নিবিষ্ট ছিলেন। হিন্দুধর্মের সার্বিক প্রসার ঘটে অনেক পরে এবং বিভিন্ন ধাপে ধাপে তা সম্পন্ন হয়। এ প্রসঙ্গে ডোম্বরু নাথের মন্তব্যটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'কোচবিহার রাজ্যে হিন্দুধর্মের যে প্রভাত রবি মহারাজা বিশ্বসিংহ ও মহারাজা নরনারায়ণের হাত ধরে উদিত হয় তা মধ্যগগনে আসতে বেশ সময় লাগে। রাজা এবং কতিপয় প্রজার হিন্দুধর্ম গ্রহণের মধ্যে দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সমগ্র রাজ্যে হিন্দুধর্মের সম্প্রসারণ ঘটানো সম্ভব হয়নি'[২৬] সম্প্রসারিত হয় অনেক পরে এবং বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে।

যোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্বসিংহ ও তার পুত্র নরনারায়ণের সময়কালে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। বলা যেতে পারে রাজবংশীদের অনেকেই ঐ সময়কালে হিন্দুধর্মাবলম্বী হয়ে পড়েন। কিন্তু উপজাতীয় নামধাম, চাষবাস, আচার বিশ্বাস সংস্কার, রীতিনীতি ইত্যাদি ত্যাগ করেননি। যোড়শ শতাব্দীর পর একটু একটু করে তাদের উপজাতীয় নামধাম ত্যাগ করে হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে পড়েন।[২৭]

সামগ্রিক বিচারে বলা যায় যে তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে নিজস্ব আচার সংস্কার বিশ্বাসের পাশাপাশি প্রাচীন বৌদ্ধ প্রভাব, শৈব প্রভাব, শাক্ত প্রভাব যেমন - মনসা, চণ্ডী, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতির প্রভাব পড়েছে। এছাড়া পরবর্তীকালে বর্ণহিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে পৌরাণিক প্রভাব, বৈষ্ণব প্রভাব, গৌরাঙ্গ প্রভাবের সন্ধান পাওয়া যায়।[২৮]

আসলে প্রাচীনকাল থেকে সভ্যতার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এই জনপদে এসে বসতি স্থাপন করেছে এবং কালক্রমে ধীরে ধীরে এক 'মিশ্র' জাতির উদ্ভব হয়েছে — তাই

এদের ধমনীতে কমবেশি পরিমাণে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি গোষ্ঠীর সব রক্তই প্রবাহিত। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, তান্ত্রিকতা, সুফী ধর্ম, পীর ধর্ম প্রভৃতি সকল বিশ্বাসে আস্থাবান এই জনগোষ্ঠী সারা ভারতবর্ষের মত এখানেও হয়েছে আর্যীকরণ, হিন্দুকরণ, ব্রাহ্মণীকরণ। বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী ব্রাহ্মণীকরণের মাধ্যমে ধর্মভুক্ত হয়েছে হিন্দু ব্রাহ্মণদের প্রয়োজনে ও প্রত্যক্ষ মদতে। মুসলমান প্রভাব ঠেকাতে গিয়ে এ-ছাড়া তাদের কোন উপায়ও ছিল না।[২৯] এই সাংস্কৃতিকরণ ব্রাহ্মণীকরণ অর্থাৎ হিন্দুকরণ চলেছে ধীরে ধীরে এবং দীর্ঘদিন ধরে। যারা পার্বত্য এলাকা থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এসে বসবাস শুরু করেছেন তাদের অনেকে হয়েছেন এই হিন্দুকরণের শিকার। কয়েক শতাব্দী ধরে চলে আসা এই সাংস্কৃতিকরণ পঞ্চদশ-ষোড়শ দশকে শংকরদেব, মাধবদেব, গোপালদেব, দামোদর দেব, অনিরুদ্ধ দেব প্রমুখ মহাপুরুষদের নেতৃত্বে সহজিয়া বৈষ্ণব আন্দোলনের মাধ্যমে ব্যাপক রূপ ধারণ করে, যা সমগ্র অঞ্চলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক মঞ্চে এনে দেয় সুদূর প্রসারী পরিবর্তন।[৩০] তবে এতদঞ্চলে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধারার প্রভাব পড়ে আরও অনেক পরে। তার আগে শংকরদেবের 'একশরণ' বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। আরেকটি বিষয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে এতদঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত হয়েছে কিনা বলা মুশকিল কিন্তু নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেবী এবং তৎপুত্র বীরভদ্রের প্রচেষ্টায় যে বঙ্গদেশের উত্তরখণ্ডে ব্যাপক বৈষ্ণব আন্দোলন আরম্ভ হয় তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।[৩১] এডওয়ার্ড গেইট বলেছেন যে, Bisu assumed the name of Bisva Singh, and his brother Sisu became Sib Singh, while many of his followers discarded their old tribal designation and called themselves Rajbansis.

Bisva Singh now became a great patron of Hinduism. He worshipped Siva and Durga, and gave gifts to the disciples of Vishnu and also to the priests and astrologers. He revived the worship of Kamakhya, rebuilt her temple on the Nilachal hill near Gauhati, and imported numerous Brahmans from Kanauj, Benares and other centres of learning.[৩২] মহারাজা নরনারায়ণের সময়কালে মহাপুরুষীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবক্তা শ্রীমন্ত শংকরদেব কোচ-রাজ্যে 'একশরণ' বৈষ্ণব

ধারার সমন্বয় ঘটান। শৈব, শাক্ত ভাবের সঙ্গে বৈষ্ণব ভাবেরও প্রসার ঘটে। অন্যদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমশ স্থিমিত হয়ে পড়ে শংকরীয় বৈষ্ণব ধারা।[৩৩] গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় ধারায় প্রভাবিত হওয়ার সূত্র ধরে রাজবংশী সমাজের সামগ্রিক ধর্মীয় ভাবনার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। মনীষী পঞ্চানন বর্মার সংস্কার আন্দোলন, ক্ষত্রিয়ত্বের মর্যাদার স্বীকৃতি আদায় রাজবংশী আচার-সংস্কারে বর্ণহিন্দুর প্রভাব সামগ্রিকভাবে এসে পড়ে। রাজবংশী সমাজের লোকায়ত ধর্মীয় বৃত্তেরও পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তীকালে আরও অনেক তথাকথিত ধর্মগুরুদের প্রভাব পড়তে শুরু করে এবং রাজবংশী সমাজের সামগ্রিক লোকায়ত কৌম বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তন সূচিত হয়। বৈষ্ণব আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকারী সম্প্রদায়ের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। গুরু ভাবনা এবং সাধু গোঁসাইদের বৈষ্ণব ভাবের প্রসারে রাজবংশী সমাজ বিপুলভাবে অনুরক্ত হয়। সেইসঙ্গে পৌরোহিত্যের কাজের মাধ্যমে সমাজের ধর্মীয় বোধের আধার হিসাবে পরিগণিত হয় অধিকারী সম্প্রদায়। পাশাপাশি বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে স্বাধীনতার মুহূর্তে অভিবাসী বর্ণহিন্দু মানুষের আগমন রাজবংশী সমাজের ধর্মীয়বোধকে প্রভাবিত করে বইকি। রাধাকৃষ্ণের প্রভাব, কীর্তন, সন্ধ্যা আহ্নিক, তুলসী তলা, গায়ত্রী মন্ত্র, দীক্ষা নেওয়া, তুলসী মালা ধারণ ইত্যাদি বিষয়গুলি রাজবংশী সমাজে বিশেষ গুরুত্ব পেতে থাকে। বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের ধর্মীয়বোধে বর্ণহিন্দুদের প্রভাব বিপুল বৃদ্ধি পায়। শৈব, শাক্তর পাশাপাশি বৈষ্ণব ভাবনার সাথে সাথে বৌদ্ধিয় ভাবনারও অবসান ঘটে। দেউসি-ওঝা কিংবা ভওরীয়ার প্রভাব কমতে থাকে। রাজবংশী সমাজের ধর্মীয় চেতনায় নতুন ধারার সূচনা হয়। স্বাভাবিকভাবে লোকায়ত ধর্মীয় বৃত্তের বিবর্তন শুরু হয়। বলা যায় কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি জেলার এই প্রভাব সামান্য কম হলেও মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের রাজবংশী সমাজ সম্পূর্ণভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনায় প্লাবিত হয়। এদিকে বর্ণহিন্দুদের প্রভাবে অধিকারী পুরোহিত সম্প্রদায়ের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। গুরুকর্তার রীতি রেওয়াজও কমে যায়। কিন্তু অন্যভাবে বর্ণহিন্দুদের প্রভাবে বৈষ্ণব ভাবনার প্রসার বাড়তে থাকে। সাত-আট দশকে রাজবংশী সমাজেও অধিকারী পুরোহিত গুরুগিরি ‘কর্তা’-র সংখ্যাও কমতে থাকে। তাঁরাই একদা রাজবংশী সমাজে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার প্রসার ঘটায়। তাঁরা দীক্ষা দিতেন তাঁদের বিভিন্ন গ্রামে শিষ্য পরিবার ছিল। বছরে একবার করে ‘কর্তা’-গুরু হয়ে উপস্থিত হতেন।

ধর্ম-শাস্ত্রাদি বিষয়ে আলোচনাও। হরি সেবার ব্যবস্থা হত। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে তাদের সংখ্যা কমতে থাকে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবধারার প্রসার ঘটতে থাকে সামগ্রিকভাবে। সীমাবদ্ধ ও পরিবর্তিত হতে থাকে লোকায়ত কৃষ্টি-আচার-সংস্কারের বিভিন্ন পর্বগুলি। রাজবংশী সমাজের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনা সম্পূর্ণভাবে বর্ণহিন্দুদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। একদা দেহতত্ত্ব, মনঃশিক্ষা গানের প্রসার, ঝোলাধারি গোঁসাই, সাধুদের সংখ্যাও কমতে থাকে। তান্ত্রিক ভাববোধের অন্তর্ধান ঘটে। আবার আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ একপ্রকার হতাশাবোধ থেকেও এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবাসক্ত হয়ে পড়ে। তার ফলে লোকায়ত ধর্মীয় অংশটি সংকুচিত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের রাজবংশী সমাজে এই ভাবনায় সবাই বৈষ্ণব ভক্ত, মালদহ জেলার ক্ষেত্রেও তাই। সেখানে বিয়ের পরই তুলসীর মালা পড়া অনুষঙ্গ হয়ে পড়ে। জন্ম-মৃত্যু সবেতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবের অন্তর্ভুক্তি ঘটে। লোকায়ত আচার-সংস্কার সহ লোকশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্র, লোকনাটক, পাঁচালী, কথন, গল্প সবেতেই বৈষ্ণবীয় ভাবনার সংযোজন ঘটে। এমনকী কোচবিহার জেলায় মদনমোহনকে মাথায় রেখেও রাধাকৃষ্ণের মাহাত্ম্য, লীলাকীর্তন, পদাবলি ভাবনায় শংকরদেব নয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবভাবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। বৈষ্ণবীয় রীতি পদ্ধতিও অনুসরণ করতে সংঘবদ্ধ হয় রাজবংশী সমাজের একটা বৃহৎ অংশ। মালদহ জেলায় চৈতন্যদেবের প্রভাব সুদীর্ঘকাল ধরে রামকেলীকে ঘিরে আবহমান হয়েছে, স্বাভাবিকভাবে নিকটবর্তী উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের রাজবংশী সমাজও সমানভাবে প্রসারিত হয়। আবার কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ মহকুমা কিংবা দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার রাজবংশী মানুষজনের মধ্যেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবভাবের প্রভাব যথেষ্টই বেশি। তুলনামুলকভাবে আলিপুরদুয়ার জেলায় কম। কিন্তু শংকরদেবের বৈষ্ণবীয় ভাবের কোন লক্ষণ আজ আর বিশেষ দৃশ্যমান হয় না। এমনকী মধুপুরধাম (কোচবিহার) এলাকাতেও নয়। যেখানে শংকরদেবের সত্র আজও বর্তমান। এখানেই বর্ণহিন্দুদের প্রভাব অনস্বীকার্য। রাজবংশী সমাজের মধ্যে এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনা প্রসারের অন্যতম কারণ অবশ্যই হতাশাবোধ। অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া, বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে না ওঠা এবং ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের পর একশ্রেণির বর্ণহিন্দুদের কাছে মর্যাদা না পাওয়া ইত্যাদি কারণে সমভাবাপন্ন জাতপাতহীন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি

পায়। সেখানে খানিকটা মানসিক স্বস্তি এবং শান্তির খোঁজেও বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের একটা বড় অংশ সামিল হয়। অনেকে তিলকধারী আদ্যোপান্ত বৈষ্ণব জীবনযাপন করছেন। বৈষ্ণবীয় রীতিনীতি সংস্কার কর্ম সম্পন্ন করছেন আর এর ফলে রাজবংশী সমাজের নিজস্ব লৌকিক পরিসরটি পরিবর্তিত হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে। এতদসত্ত্বেও দেখা যায় একটা প্রভেদরেখা অদৃশ্যভাবে দৃশ্যমান, সেটা কীর্তনের দলগুলোকে দেখলেই বোঝা যায়। সেখানে এখনও সূক্ষ্মভাবে সম্প্রদায়, গোষ্ঠীবোধ সক্রিয়। ফলত: রাজবংশী সমাজের মধ্যেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবভাবের নিজস্ব বৃত্ত তৈরি হচ্ছে। তবে সামগ্রিকভাবে এটা বলা যায় যে রাজবংশী সমাজের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। কিন্তু পুরোনো হরিবাড়ির গৌরব এখন আর নেই, হরি বাড়িগুলির সামগ্রিক ছবিটা এখন বলা যায় বর্ণহিন্দুদের ধর্মীয় বোধভাবনাতেই আবর্তিত। রাজবংশী সমাজের কিছু মানুষের উদ্যোগে স্থাপিত হলেও অতীতের সেই ধর্মীয় পরিসর এখন হরিবাড়ির বাইরে। মহানাম সংকীর্তনে সেটা এখন প্রতি বছর মুখরিত হয়। সেখানে রাজবংশী সমাজও অংশীদার বর্ণহিন্দুদের অনুসারী হয়ে। অতীতে এই হরিবাড়িকে ঘিরে রাজবংশী সমাজের সামগ্রিক ধর্মীয় বৃত্তটি আবর্তিত হত। হরিমন্দিরে শিব কালী থেকে গ্রামঠাকুর ও অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর থান ছিল। বিভিন্ন সময় পরবে এই হরিবাড়ি মুখরিত হত। নামে ছিল হরিবাড়ি কিন্তু হরিবাড়িকে ঘিরেই গ্রামের সব পরিবারের ধর্মীয় সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটত। রাজবংশী সমাজ জীবনে হরিবাড়ি, কীর্তন, তুলসী তলা সবই ছিল এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন সংস্কারের ফলশ্রুতি। রাজবংশী ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি উর্বর হয়েছে এই নবধর্ম ধারায়। হরি লুঠ, খই ছিটানো, বাঁশ পূজা, মদনকামের গান, গোরখনাথের মাগনের গান সবেতেই নাম কীর্তনের সংযোজন হয়। হরিবাড়ির গুরুত্ব অন্যভাবে বৃদ্ধি পায়। সেখানে সমস্ত পূজা পরবের বিষয়গুলিও আবর্তিত হয়।

রাজবংশী সমাজে কীর্তনের সূত্রপাত ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই। শংকরদেব বৈষ্ণবীয় ভাবনায় রাজবংশী সমাজের বৃহত্তর অংশ যখন অনুরক্ত হয়। তুলসীতলা, সন্ধ্যাপ্রদীপ, ডাকনাম সংকীর্তন ইত্যাদি রাজবংশী ধর্মীয় আচার-সংস্কারের অঙ্গীভূত হয়। কিন্তু লোকায়ত মূল সংস্কৃতি বিশেষ প্রভাবিত হয় না। কিন্তু চৈতন্যীয় প্রভাবে শ'দুয়েক বছর আগে এতদঞ্চল তথা রাজবংশী সমাজে প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। শাক্ত ভাবের

প্রভাব কমে। দেহতত্ত্ব, মনঃশিক্ষা গানের সংযোজন ঘটে। কীর্তনের শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হয়। অধিকারী তুলসীধারী পুরোহিতরা নবদ্বীপ থেকে গান সংগ্রহ করে নিজেদের ভাষা-শব্দ ব্যবহার করে গান রচনা করতে থাকেন। ফলে রাজবংশী ভাষাতেও বহু কীর্তনের সন্ধান পাওয়া যায়। আবার বিভিন্ন পর্বের অনুষ্ঠানে সে গৃহপ্রবেশই হোক, ব্রত-তিথি পালন কিংবা শ্রাদ্ধশান্তি সবেতেই কীর্তন আবশ্যিক হয়ে ওঠে। এভাবেই রাজবংশী সমাজে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবধারার প্রসার ঘটে। পরবর্তীকালে বর্ণহিন্দুদের প্রভাবে সেটা আরও বেগবান হয়। লৌকিক দেবদেবীর প্রতি আস্থা, প্রভাব কমতে থাকে। চৈতন্যীয় প্রভাবেই অধিকারী নামক দেশীয় পুরোহিতদের প্রভাব বাড়তে থাকে। তারা নৈবেদ্য, সেবা দেওয়ার সাথে সাথে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার প্রচারের কাজটিও সম্পন্ন করে যান। তুলসী মঞ্চ, তুলসী আসন, তুলসী সিংহাসন, গোপাল ঠাকুর ইত্যাদি কিছু বিষয় নিয়ম রীতি, মন্ত্রাদি যুক্ত হয়। অন্যান্য মন্ত্রাদিতেও এই ভাবনার অন্তর্ভুক্তি ঘটে সূক্ষ্মভাবে। সেটা অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়। বলা যায় বৈষ্ণবীয় ভাবনার সম্প্রসারণ ঘটে। সেটা লোকশিক্ষা, নীতিশিক্ষার বিভিন্ন মাধ্যম লোকনাটক, গান তথা প্রবাদ-প্রবচন থেকে বিভিন্ন ধর্মীয় গীতে, পাঁচালীতে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামে গঞ্জে ভাষাতেও পার্থক্য তৈরি হয়। পালাগানের বিষয় বর্ণনে রাজবংশী শব্দের বদলে বাংলা শব্দের মিশ্রণ ঘটে। মান্যতাও পেতে থাকে। বর্ণহিন্দুদের প্রভাবে সেই প্রবণতা আরও বেড়ে যায়। আজকের সময়ে লোকনাটকগুলিতে যেটা রীতিমতো উল্লেখের বিষয়। গীদাল নামক মূল ব্যক্তি এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাংলাতেই ব্যাখ্যান করেন। পোষাক-আশাক, আঙ্গিক ও ভঙ্গিও পরিবর্তিত হতে থাকে। আর এভাবেই সমাজের ধর্মীয় ভাবাবেগের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ, ভাষা, ভঙ্গি এবং আচরিত রীতিনীতি বদলে যায়। ধর্মও সূক্ষ্মভাবে এই পরিবর্তনকে তরান্বিত করে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের অন্তর্ভুক্তির ফলে রীতি-পদ্ধতি, প্রকরণও পরিবর্তিত হয়। শুধু ধর্মীয় পরিবর্তন নয় সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। আর যেহেতু রাজবংশী সমাজের সংস্কৃতির পরিসরটি বলা যায় ধর্মীয় বৃত্তেই আবর্তিত, স্বাভাবিকভাবে তাই এই ধর্মীয় বিবর্তনের প্রক্রিয়া রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের অন্যতম একটি কারণ বটে।

ক্ষত্রিয়করণ এবং বৈষ্ণবীয় প্রভাবে রাজবংশী সমাজের লোকসাংস্কৃতিক পরিসরটি বিবর্তিত হয়। এছাড়াও আরও কিছু ধর্মগুরুর মত বিশ্বাসেও রাজবংশী পরিবারগুলির জীবনচর্যা, ধর্মীয়বোধ

ও সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে। বৈষ্ণবায়নে যেমন বৈষ্ণবীয় কৃত্যাদি সংযুক্ত হয় তেমনি বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের অনেকের জন্ম, মৃত্যু ও অশৌচের ক্ষেত্রে ৪০-৪২ দিনের নিয়ম রীতি পালনের পর ছয় গোঁসাই অর্থাৎ বৈষ্ণব এনে বিশুদ্ধিকরণ, কীর্তন, ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। সেখানে লৌকিক আচার বিচারের কোন গুরুত্ব থাকে না। বিয়ের ক্ষেত্রে 'কণ্ঠি বদল' নিজস্ব ধর্ম ও লোকাচারকেও নস্যাৎ করে।

বিভিন্ন ধর্মগুরুদের ধর্মীয় বোধ ভাবনাতেও বহু রাজবংশী মানুষ যুক্ত হয়েছেন। বহু মানুষ যেমন তুলসীর মালা, কপালে তিলক ধারণ করেছেন তেমনি অনেকেই গুরুভাই, অনুকূল ঠাকুর, স্বামী স্বরূপানন্দ, বালক ব্রহ্মচারীর শিষ্য পথিক। যেকোন ধর্মাচরণ মানুষকে উন্নত করে, পরিশীলিত করে। কিন্তু যেটা উদ্বেগের বিষয় সেটা হল জনগোষ্ঠীর নিজস্ব লোকায়ত ধর্মীয়, সামাজিক, সংস্কৃতির আমূল বদল ঘটছে। বিশেষ করে অনুকূল ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে এটা লক্ষণীয়। বহু রাজবংশী পরিবার অনুকূল ঠাকুরের শিষ্য হয়েছেন। জন্ম থেকে বিয়ে, মৃত্যুর পারলৌকিক ক্রিয়াদি অবধি অন্য ধারায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সকাল সন্ধ্যার নিত্য কৃত্যাদির মধ্যে তারা আবদ্ধ হচ্ছেন। সামাজিকভাবেও তারা স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রাখছেন। বালক ব্রহ্মচারীর শিষ্যদের মধ্যেও কিছু নিয়মাচার রাজবংশী পরিবার গুলির ঘরোয়া ভাবে যা ভাষা-সংস্কৃতি ও মানসিক স্তরের ক্ষেত্রে বিবর্তনকে তরান্বিত করছে। জাতি সত্তা কিংবা নৃ-গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রেও যা অক্ষুণ্ণ থাকা জরুরি। সংস্কৃতির বিবর্তন স্বাভাবিক যা এক পদ্ধতির মধ্যে ঘটে, সংস্কৃতির ধর্মও তাই। রাজবংশী সমাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিষয় ও প্রভাব ভিন্নতর এক বিবর্তনকে আহ্বান করছে।

রাজবংশী সমাজের ধর্মীয় বিবর্তন ধারাবাহিক প্রেক্ষিতে ঘটে। আদিম সংস্কৃতির ধারক বাহক হিসাবে রাজবংশী জনগোষ্ঠীও সর্বপ্রাণবাদ (animism) জড়বাদী প্রাকৃত বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল। পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে রাজবংশী সমাজ সংগঠনের পরিবর্তনের সাথে সাথে দেবদেবীরও সংযোজন ঘটে। অস্থায়ী জীবনবৃত্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে স্থায়ী পরিবার, সমাজ ও কৃষি ভাবনার সম্প্রসারণ ঘটে। ব্যক্তি মালিকানা থেকে পরিবার সমাজ সংগঠন গড়ে ওঠে। রাজবংশী সমাজের অন্যতম দেবতা হয়ে ওঠে শিব। কৃষকের প্রতিভূ, জগৎ সংসারের নিয়ন্ত্রক। এই শৈব ভাবনার পরবর্তীকালে কোচ-রাজবংশের ভিত্তি স্থাপিত হয়। শৈব ভাবনার হাত ধরে হিন্দুধর্মের

পৃষ্ঠপোষকতা শুরু হয়। আদিম ঐতিহ্য জড়বাদী ভাবনা, তান্ত্রিক আচার-বিচার ও শাক্ত ভাবনারও সম্পৃক্তায়ন ঘটে। বর্ণহীন, ভেদাভেদ বর্জিত রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির কৌম চিহ্নগুলি সম্পূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকে। এই ধর্মীয় সংস্কৃতি আধারে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি সুদীর্ঘকাল আধারিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি শংকরদেবের আগমন ঘটে। পরবর্তীকালে বর্ণহিন্দুদের প্রভাব পড়তে শুরু করে। ভেদাভেদ তৈরি হয়। যদিও রাজপৃষ্ঠপোষকতায় শংকরদেবের 'একশরণ' ধর্মের প্রসার ঘটলেও রাজবংশী জনজীবনের আদিম ঐতিহ্যভিত্তিক আচার সংস্কারগুলি অব্যাহত থাকে। তবে হ্যাঁ, শংকরদেবের আবির্ভাবের ফলে রাজবংশী সমাজের বৃত্তি, কৃষিভাবনার উন্নতি হয়, সম্প্রসারণ ঘটে বলা যায়, ঝুম চাষ বা পরিবর্তিত চাষের পরিবর্তন ঘটে। লাঙ্গলের ব্যবহার শুরু হয়। কৃষি প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে। ভিত যুক্ত বাড়িঘর নির্মাণের প্রচলন ঘটে। পরিবার, সমাজের ভাবনাও কার্যকরী হয়। ধর্মীয় কাঠামোয় সামান্য কিছু পরিবর্তন ঘটে। শৈব ভাবনার সাথে সাথে বৈষ্ণব ভাবনায় রীতিনীতি, আচার-বিচার, সংস্কার প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার সংস্পর্শে রাজবংশী সমাজ-সংস্কৃতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। বলা যেতে পারে শৈব ভাবনার সঙ্গে বৈষ্ণব ভাবনার সূক্ষ্ম এক বিভেদ রেখাও সূচিত হয়। যদিও রাজানুকূল্যে মদনমোহন বাড়িতে শৈব ও বৈষ্ণব ভাবনার সমন্বয় সাধনেরই চেষ্টা হয়। এই সম্পৃক্তায়নও অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ঘটানো হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের সময়কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। রাজবংশী সমাজে 'হরিবোলা ঠাকুর' ডাকনামের সূচনা হয়। নবদ্বীপ থেকে শিক্ষালাভ করে অধিকারী পুরোহিতরা পূজা-অর্চনার অধিকার পায়। শিষ্যত্ব প্রদান ও গুরু সেবার মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ভাবনার প্রচার করতে থাকে। সূক্ষ্ম এক ভেদাভেদী শুদ্ধাচার, ছুঁৎ, অচ্ছুত ভাবনার অন্তর্ভুক্তি ঘটে। বর্ণভেদ, গোত্রভাগ ইত্যাদি বিষয়গুলিও গুরুত্ব পেতে থাকে। বর্ণহিন্দুদের বেশ কিছু রীতি আচার অনুকরণের প্রবণতা তৈরি হয়। ভেদাভেদ শ্রেণিবিন্যাসের বিষয়গুলি গুরুত্ব পায়। রাজবংশী সমাজের আদিম সংস্কৃতি, তন্ত্রাচার, গুহ্য সাধনার সঙ্গে সরাসরি বিরোধ তৈরি হয়। শৈব, শাক্ত ভাবনার সঙ্গে বৈষ্ণব ভাবনার সমন্বয় নয় সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে। রাজবংশী পরিবার, সমাজ পুরোহিত নিয়ন্ত্রিত এবং গুরু শিষ্যের পরম্পরার বশবর্তী হয়। সমাজে ধর্মীয় বিষয়ে অধিকারী পুরোহিতের প্রাধান্য বাড়তে থাকে। রাজবংশী ভাষা শব্দের বদলে বর্ণহিন্দুদের ভাষা শব্দের ব্যবহার শুরু হয়। মন্ত্র পালটে যায়।

লোকসংগীতে 'কালা' কৃষ্ণ হয়ে উপনীত হয়। পালাগানের আসর বন্দনায় রাম, কৃষ্ণ গুরুত্ব পেতে থাকে। কুশানে রামায়ণ কাহিনি কথার, রামমঙ্গল, কৃষ্ণকথার অন্তর্ভুক্তি ঘটে। সেই হিসাবে বলা যায় কুশান গান দোতরা পালাগানের তুলনায় অনেক পরবর্তী সংযোজন। শ'দুয়েক বছর আগের সংযোজন বলা যায়। দোতরা পালাগানে যেখানে সামাজিক, ঐতিহাসিক ঘটনার পরম্পরা সেখানে কুশান সম্পূর্ণরূপে রামায়ণ ভিত্তিক হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে শংকরদেবের প্রভাব যথেষ্টই অস্তায়মান হয় এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনায় রাজবংশী সমাজের প্রায় সবাই বশবর্তী হয়। আচার-বিচার, সংস্কার, শুচি-অশুচি ইত্যাদি ভাবনায় পরিবর্তন শুরু হয়। এরকম এক সন্ধিক্ষণে রাজবংশী সমাজ পুনরায় সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বর্ণহিন্দুদের আধিপত্য, তাদের রীতিনীতির প্রভাব, তাদের রাজবংশী সমাজকে অবহেলা, ঘৃণার চোখে দেখা ইত্যাদি বিষয়গুলির জন্য একপ্রকার হীনমন্যতাবোধ রাজবংশী সমাজে দেখা দেয়। তথাকথিত বর্ণবাদী ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থা জাতিভেদ প্রথার বশবর্তী হয়ে বর্ণ বিভাজনে শ্রেণি বিষয়টি গুরুত্ব পেতে থাকে। পাশাপাশি কৃষি নির্ভর রাজবংশী সমাজকে বর্ণহিন্দুদের তথাকথিত উচ্চশ্রেণির শিক্ষিত উকিল, মোক্তার, বুদ্ধিজীবীরা হেয় প্রতিপন্ন করতে (নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষে রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে 'ম্লেচ্ছ', বর্বর হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়)শুরু করে। এই সময়ে জমিদার হরিমোহন খাজাঞ্চি 'ক্ষত্রিয় জাতির উন্নতি বিধায়নী সভা' এবং ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে রংপুরের জোতদার ও জমিদারগণ 'ক্ষত্রিয় সমিতি' তৈরি করেন। পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন সূচিত হয়। কোচ ও রাজবংশী আলাদা জাতি এবং রাজবংশী জাতি 'ক্ষত্রিয়' এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য দীর্ঘ আন্দোলন সংগঠিত হয় এবং ব্রিটিশ সরকার রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে ক্ষত্রিয় পরিচয় দিতে বাধ্য হন। পণ্ডিত মহলও রাজবংশী জাতিকে স্বতন্ত্র এবং 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' হিসাবে সম্মতি প্রদান করেন। তারপরেই শুরু হয় সমাজ সংস্কার আন্দোলন। জাতির উন্নতি, পদবি পরিবর্তন, উপবীত ধারণ, খাদ্য বিচার, ক্ষাত্রোচিত আচরণ, নিয়ম-রীতি সংস্কার (মৃত্যু অশুচ ৩০ দিনের বদলে ১২ দিন) ইত্যাদি বিবিধ বিষয় রাজবংশী সমাজে অন্তর্ভুক্ত হয়। শুরু হয় বর্ণহিন্দুদের অনুকরণে সমাজ সংস্কৃতির সংস্কার। বলা যেতে পারে ধর্মীয় সংস্কৃতির উপাদানগুলি পরিবর্তিত হতে থাকে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ক্ষত্রিয় সমিতির আন্দোলন, কোচ ও রাজবংশী গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যতার

স্বীকৃতি আদায় ও ক্ষত্রিয় হিসাবে রাজবংশী সমাজের নথিভুক্তকরণ রাজবংশী সমাজ-সংস্কৃতির পক্ষে এক চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারার প্রসারের পর রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্ষত্রিয় সমিতির উদ্যোগে আচার বিধি প্রচার, শাস্ত্রীয় রীতি আচার অনুসরণ, ধর্মীয় বিষয়ে কিছু বিধিনিষেধের পাশাপাশি সামগ্রিক উন্নয়নের বার্তা দেওয়া হয়। বলা যেতে পারে এর ফলে বর্ণহিন্দুদের আচার-সংস্কার রীতিনীতির অনুগ্রহণ প্রবণতা বৃদ্ধি পায় রাজবংশী সমাজে। একটা বৃহৎ অংশ বর্ণহিন্দুদের অনুকরণের বশবর্তী হয়। আবার একটা অবস্থাপন্ন অংশ শহরবাসী হয়ে গ্রাম সমাজ বিমুখ হয়ে ওঠে। আরেকটি অংশ প্রতিযোগিতার ভাগীদার হয়ে ব্যবসা, চাকুরি ও বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হয়ে সংস্কৃতি বিমুখ হয়ে পড়ে। স্বাধীনোত্তর পরবর্তীকালে জমিদারি উচ্ছেদ আইন ও ভূমি সংস্কার আইনের ফলে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কারণ অনেকে জমি হারিয়ে প্রান্তিক হয়ে পড়ে। একটা বড় অংশ কৃষি থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্যান্য পেশায় ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে একটা শ্রেণি তৈরি হয় যারা মধ্যবিত্ত সমাজ হিসাবে নিজেদের প্রতিপন্ন করে তারাও সংস্কৃতিগত দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। গ্রাম সমাজ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে জীর্ণ হতে থাকে। গান বাজনা থেকে পাল পরবের বিষয়গুলি সংকুচিত হতে থাকে। রাজবংশী সমাজের সংস্কৃতি যেহেতু বৃত্তি পেশা কৃষিকে ঘিরে এবং পৃষ্ঠপোষকতা নির্ভর আচারগত, সংস্কারগত পূজা-অর্চনা, পাল-পরবকে ঘিরে শুধু ধর্মীয় নয় সামগ্রিক সংস্কৃতির বিষয়টি সম্পৃক্ত থাকায় সাংস্কৃতিক বলয়টি ছিন্ন ভিন্ন হয়। অনেককিছুই লুপ্তপ্রায় হতে থাকে। কিছু হারিয়ে যায়। আবার ভৌগোলিক যোগাযোগ, শিক্ষা, প্রযুক্তি সর্বোপরি মননভাবনার পরিবর্তনেরও রাজবংশী সমাজের লোকায়ত সংস্কৃতির পরিসরটি সংকীর্ণ হতে থাকে। তদুপরি বিনোদনের উপকরণ টিভি, সিনেমা সহ আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিবর্তন অপেক্ষা সংকটাপন্ন হয় বলা যায়। এটা ঠিক ক্ষত্রিয়করণ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজবংশী সমাজের একটা বৃহৎ অংশের মধ্যে বর্ণহিন্দুদের সমাজ সংস্কৃতি ধর্মের প্রতি অনুকরণাত্মক ঝোঁকটাই মুখ্য হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি উদাসীনতা এমনকী হীনমন্যতাবোধের বিষয়টিও কার্যকরী হয়। ফলে সাংস্কৃতিক বিবর্তন নয় বলা যেতে পারে সাংস্কৃতিক সংকট। ইতিমধ্যে বর্তমান প্রজন্মের একটা বড় সংখ্যায় যুবক-যুবতী কাজের সন্ধানে ভিন দেশে পাড়ি দেওয়ার ফলে সাংস্কৃতিক সংকট তরান্বিত হয়েছে। জাতিসত্তা, আত্মউন্মোচন, আত্মঅধিকার

প্রতিষ্ঠার মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলির পাশাপাশি ভিন্ন এক সাংস্কৃতিক সংকটের জন্ম হয়। যে ক্ষত্রিয়করণ আন্দোলন রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ নবতম ধারার সূচনা ঘটাতে পারত সেখানে রাজবংশী সমাজ সুসংগঠিত হলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বলা যায় অনেকটাই সংকটাপন্ন হয়। অথচ মনীষী পঞ্চানন বর্মার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জাতিসত্তার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজস্ব সমাজ, ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি তথা ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করা। সেই জায়গাটায় বিশেষ করে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রটিকে যথাযথ বিবর্তনের ধারায় সমৃদ্ধ করা যায়নি। স্বাভাবিকভাবে সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণে সাংস্কৃতিক বিবর্তন অপেক্ষা সাংস্কৃতিক সংকটের বিষয়টি উঠে আসে। বিশেষ করে এটা উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। অন্যান্য প্রদেশে প্রাদেশিক চাপ ও প্রভাব বিভিন্ন ভাবে কার্যকরী কিন্তু উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে বিবর্তন অপেক্ষা সংকটই মুখ্যত লক্ষমান। আবার কোচবিহার জেলাকে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির পৃষ্ঠভূমি হিসাবে যেহেতু ধরা হয় স্বাভাবিকভাবে কোচবিহার জেলাতেই সামগ্রিকভাবে এই পরিবর্তন বেশি ঘটেছে বলা যায়। অন্যান্য জেলাগুলিতেও এই পরিবর্তন ঘটেছে যা অপেক্ষাকৃত কম হলেও উল্লেখযোগ্য। তা সত্ত্বেও কোচবিহার জেলাকে এখনও সামগ্রিকভাবে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি তথা ভাওয়াইয়া সমাজ সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি বলা যায়। কিন্তু অন্যান্য জেলাগুলিতে এখনও ভাওয়াইয়া সংস্কৃতির অনেক উপাদানই অক্ষত অবস্থায় বর্তমান। সাংস্কৃতিক বিবর্তনের অঙ্গ হিসাবে অনেক গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়েও রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির এই বহমানতাই নৃতত্ত্বের বিচারে উল্লেখযোগ্য। আর এখানেই প্রমাণ হয় রাজবংশী জনগোষ্ঠী একটি স্বতন্ত্র কৌম জনগোষ্ঠী এবং এক ধারাবাহিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিজস্ব গোষ্ঠী পরিচয়ের অনেক কিছুকে বহন করে চলেছে। যাকে আমরা সাংস্কৃতিক বিবর্তনের অনুষঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করতেই পারি।

• সাহিত্যে সংস্কৃতির বিবর্তন

সাহিত্যে রাজবংশী সমাজ-সংস্কৃতির উপাদান ও বিবর্তনের পর্যায়গুলিও ধরা পড়েছে। সেটা যেমন রাজবংশী সমাজের বিস্তৃত মৌখিক সাহিত্যে (oral literature) তেমনি বাংলা সাহিত্যের কাব্য, আখ্যান ও গল্পেও। পরবর্তীকালে রাজবংশী ভাষায় সাহিত্য-সৃজনে সমাজ, সংস্কৃতি, মনন ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। সর্বোপরি সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক উপর্যুপরি রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের ছবিও আমরা পেয়ে যাই। রাজবংশী সমাজের লোকসাহিত্য অর্থাৎ মৌখিক সাহিত্যের ভাণ্ডারটি সুবিস্তৃত। আদি কৌম চিহ্ন যেমন বিভিন্ন উপাদানে ছিটিয়ে ছড়িয়ে আছে তেমনি তা সমৃদ্ধ সুদৃঢ় সমাজ কাঠামোর ইঙ্গিত দেয়। প্রবাদ-প্রবচন একটি জাতি-গোষ্ঠীর সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার সঞ্জাত ফসল। এরকম অজস্র প্রবাদ-প্রবচন রাজবংশী সমাজ জীবনের অনুষঙ্গে প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হয়। কথায় কথায় শ্লোক-প্রবাদ উচ্চারণ প্রবীণ-প্রবীণাদের মধ্যে এখনও দেখা যায়। উপমা-ব্যঞ্জনাময় কথার মধ্যে জীবনরসেরও সন্ধান পাওয়া যায়। সহজ সরল প্রকৃতি নিবিড়তায় সম্পৃক্ত জীবনযাপনের ছবিই ধরা পড়ে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানগুলিতে। সেটা ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে যেমন তেমনি পূজা-পার্বণকেন্দ্রিক গান কিংবা আমোদপ্রমোদের গানেও। ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের সম্ভারে রাজবংশী সমাজ জীবনের আদ্যপান্ত বিষয়গুলি নির্মলভাবে ধরা পড়েছে। সেইসঙ্গে সমাজ, অর্থনীতি, জীবন-জীবিকার যাবতীয় বিষয়গুলি গানের কথাভাষ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুত রাজবংশী লোকসাহিত্যের উপাদানগুলির মধ্য দিয়েই এই জনগোষ্ঠীর জীবনচর্যা, উত্তরণ, সমাজ-সংগঠন, মননদর্শন, চাওয়া-পাওয়া, জীবন আভাস, ধর্ম, পরিসর, অভিব্যক্তি সবই ধরা পড়েছে। এই লোকসাহিত্যের উপাদানের মধ্যেই রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয় ও জাতিসত্তার বিষয়গুলি আবদ্ধ হয়েছে যুগ যুগান্তের ধারাবাহিক প্রবহমানতায়। তার সঙ্গে গ্রন্থিত হয়েছে বিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলিও।

রাজবংশী সমাজের লোকসাহিত্যের উপাদানগুলি সুদীর্ঘকাল মৌখিক সাহিত্য হিসাবে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। কোচ-মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কোচ রাজ্যে সাহিত্যচর্চার ধারাটি প্রথমাবধি সমৃদ্ধ থাকলেও মূলত পুরাণ-শাস্ত্রাদির অনুবাদ কর্মই সম্পাদিত হয়। তুলনায় মৌলিক রচনার পরিসরটি যথেষ্ট সীমাবদ্ধ ছিল। তার মধ্যেই হরেন্দ্রনারায়ণের সময়কালে (১৭৮৩-১৮৩৯ খ্রি:) দু'একজন প্রতিভাধর লোককবি তাঁদের সৃজনকর্ম নীরবে নিভৃতে সম্পন্ন করেন। এ'রকমই

একজন কবি রাঁধাকৃষ্ণদাস বৈরাগী, তিনি মঙ্গলকাব্যের অনুকরণে গোসানীদেবীর প্রচলিত আখ্যানকে ভিত্তি করে রচনা করেন 'গোসানীমঙ্গল' কাব্য, সময়কাল আনুমানিক ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ। এই গোসানীমঙ্গল কাব্যে ধরা পড়েছে খেন বংশীয় রাজা নীলধ্বজ, চক্রধ্বজ, নীলাম্বরের কাহিনি সহ তৎকালীন সময়কালের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিভিন্ন চিত্র। 'গোসানীমঙ্গল' কাব্যটিকে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে সর্বার্থে গুরুত্ব না দেওয়া গেলেও এই কাব্যের মধ্যে তৎকালীন অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থার চিত্র যেমন পাওয়া যায় তেমনি সে সময়কার গৃহনির্মাণের প্রকার পদ্ধতি, আনুষঙ্গিক অস্ত্রশস্ত্রাদি, বাস্তুভাবনার ছবিও প্রতিফলিত হয়েছে। বন কেটে বসতিস্থাপন, হাট, বাজার-নগর-বন্দর পত্তন সেইসঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের কথাও জানা যায়। আবার সামাজিক বিন্যাস, ভয়-ভীতি, দুঃখ-কষ্টের কথা, জীবনচর্যার বিষয়াদি সবই কাব্যের কাহিনিতে স্থান পেয়েছে। শিকারের কথা, জ্যোতিষশাস্ত্রের কথা, ভগবান তথা দেবতার প্রতি আস্থার কথা, ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস কোন কিছুই বাদ যায়নি। ওজা-কবিরাজের প্রভাব, তাদের রোগ সারানোর পদ্ধতি, তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়গুলি তৎকালীন সমাজজীবনের অবস্থা ও অবস্থানকে চিহ্নিত করে। নারীর গর্ভধারণের বিষয় ও গর্ভধারাণীর সময় পর্যায়গুলি অঙ্গনার গর্ভে কান্তেশ্বরের জন্মবৃত্তান্তে বর্ণনা করতে গিয়ে তৎকালীন গ্রামবাংলার সমাজচিত্রই তুলে ধরেছেন কবি রাঁধাকৃষ্ণদাস বৈরাগী। পোষাক-আশাক (বুক বান্ধানা, আগরণ, ফোতা) থেকে স্বর্ণালংকারের (নূপুর, মতিহার, টোপর) বর্ণনাও তিনি করেছেন। বাঁশের চোঙ, থুরি, মাটির তৈরি হাড়ি, কলসি, ঘটি ইত্যাদির উত্থাপন করে রাজবংশী সমাজজীবনের সামগ্রিক চিত্রটিকে তিনি স্পষ্ট করেছেন। খাদ্যাভ্যাসে তিনি যেমন বিভিন্ন খাবারের (শুকটা, সিদল) উল্লেখ করেছেন তেমনি রাজবংশী সমাজে দই-এর বাহুল্য, ক্ষার ব্যবহার, মজাগুয়া খাওয়া ইত্যাদিও বাদ দেননি। ছেলেধরার বিষয়টিকে উল্লেখ করে তৎকালীন সময়ে 'নরবলি' দেওয়ার প্রথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সর্বোপরি ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার, প্রথা বিষয়গুলি প্রকারান্তরে উত্থাপন করেছেন। বাদ দেননি তৎকালীন সময়ে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র এমনকী লোকক্রীড়াগুলির নাম উল্লেখ করতেও। স্বাভাবিকভাবে এই কাব্যের ব্যাখ্যান থেকে তৎকালীন সময়ে রাজবংশী সমাজের জীবনযাত্রা তথা সমাজ জীবনের বিস্তৃত বিবরণ পেয়ে যাই। যা পরবর্তীকালের সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার ক্ষমতা রাখে। ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজবংশী

সমাজ জীবনের অন্যতম দলিল হিসাবে এই কাব্যটিকে আমরা বিবেচনা করতে পারি কারণ ইতিহাসগতভাবে কান্তেশ্বর জন্মবৃত্তান্তকে সত্যাসত্যের বিচার বিবেচনায় রাখলেও সমাজ জীবনের ছবির ক্ষেত্রে প্রশ্নের কোন অবকাশ নেই যা রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি এবং অন্যতম লিখিত উপাদান।

'গোসানীমঙ্গল' কাব্যে খেন বংশের রাজা কান্তেশ্বরের জন্মবৃত্তান্ত, তার খেন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা এবং নীলাম্বরের আমলে সেই বংশের অবসান ইত্যাদি বিষয়গুলি লৌকিক ও অলৌকিক কাহিনির বিন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের আরাধ্য দেবী গোসানী অর্থাৎ চণ্ডী। গোসানীমঙ্গল একটি স্বতন্ত্র মঙ্গলকাব্য হিসাবে স্বীকৃত। প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ে ভীত ও শাসন-শোষণে সন্ত্রস্ত জাতি অত্যাচারের বিপদের হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায় বিভিন্ন দেবদেবীর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। এর ফলে লৌকিক দেব দেবীরা মেয়েলি ব্রতকথার জগৎ ছেড়ে মঙ্গলকাব্যের দেব দেবীতে পরিণত হয়। রাষ্ট্র বিপ্লব, দুঃখ-কষ্ট, সংকট থেকে মুক্তি পেতে নতুন দেবভাবনার সৃষ্টি হয় — এই দৃষ্টিকোণ থেকে গোসানীমঙ্গলের দেবী গোসানীকে চণ্ডীর নতুন রূপ হিসাবে কবির কল্পনায় ধরা পড়েছে। সময় প্রেক্ষিত বিচারে মঙ্গলকাব্য রচনার চিহ্নিত সময়কাল (ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শকত অবধি) উত্তীর্ণ হলেও অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে কিংবা উনিশ শতকে কোচ রাজ্যের অবস্থার প্রেক্ষিতে এই কাব্যের রচনা ধরা যেতে পারে। রাজা কান্তেশ্বরের আবির্ভাবের পূর্বে কামতাপুর তথা কোচবিহার রাজ্যের জীবনযাত্রা এবং রাষ্ট্রিয় অবস্থা পর্যালোচনায় বিষয়টি পরিষ্কার হয়। এই ব্যাখ্যানই তাঁর রচনায় ধরা পড়েছে —

... ...

"বেহারে নাহিক রাজা ব্যাকুল হইল প্রজা
অরাজক কত কাল।।
হইল আকাশ বাণী, পূজা কর মা ভবানী,
পূন্য হবে রাজ্যের ঈশ্বর।।
গোসানী করহ পূজা, সুখে রবে যত প্রজা,
রাজা হবে কান্তেশ্বর।।"

এই উক্তি সে সময়কালের জনজীবনের ধর্মীয় ভাব-অনুভবকে স্পষ্ট করে। হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতির

অনুসরণে গোসানী অর্থাৎ চণ্ডীর প্রাধান্য ঘোষিত হয়েছে। গোসানী দেবী এখানে অন্য মঙ্গলকাব্যের দেবীর মত নন। প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকাব্য রচনার সাধারণ রীতি অনুসরণ করে রাঁধাকৃষ্ণদাস বৈরাগী 'গোসানীমঙ্গল' কাব্যটি রচনা করেছেন। রাঁধাকৃষ্ণদাস বৈরাগী নামের মধ্যেই ধরা পড়েছে সে সময় বৈষ্ণব ধর্মের যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটেছে এই এলাকায় এবং সেটা শংকরদেবের 'একশরণ' বৈষ্ণব ভাবনা নয় সেটা গৌড়িয় বৈষ্ণব ভাবের। সে সময় এইসব অঞ্চলে বৈরাগী উপাধি ধারণ করে অনেক বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে গান করে বেড়াতেন অনেকটা রংপুরের নাথ যোগী বা যুগীদের মত। তাঁরাও লৌকিক-অলৌকিক কাহিনি গেয়ে ধর্মেরই প্রচার করতেন। এই বৈরাগী সম্প্রদায়রা তখন ছিলেন ভ্রাম্যমান লোককাহিনির ধারক ও বাহক। তাঁদের মাধ্যমেই সমসাময়িক ঘটনা গ্রাম-গঞ্জে প্রচার পেত। লোকশিক্ষার পাশাপাশি লোক সাংবাদিকতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাঁরা পালন করতেন। আরেকটি বিষয় খেন রাজারা কামতেশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন। এই 'কামতেশ্বর' উপাধির সঙ্গেই যুক্ত হয়ে আছে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব। কামতেশ্বর শব্দটি এসেছে কামদেশ্বর শব্দ থেকে এবং কামদেশ্বর সংক্ষিপ্ত হয়ে দাঁড়ায় কামতেশ্বর বা কান্তেশ্বর। কালিকাপুরাণ মতে কামদা হল 'মা কামাখ্যা'। মাতৃকা দেবী পৃথিবীর আদিমতম প্রতীক যোনী। কালিকাপুরাণে এই অঞ্চলে যে নয়টি যোনী পীঠের উল্লেখ আছে সিদ্ধপাঠ বা সিদ্ধেশ্বরী এবং কামপীঠ বা কামতেশ্বরী তার মধ্যে অন্যতম। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে তান্ত্রিকধর্মের প্রভাব অপসৃত হয়ে কামতেশ্বরী হয়ে ওঠেন কামতাপুরের গোসাঞী দেবী-গোসানী দেবী-দেবী চণ্ডিকা।

রাজবংশী সমাজে বৌদ্ধিয় প্রভাব অতীতে যথেষ্টই ছিল। তন্ত্রমন্ত্র থেকে তন্ত্র সাধনার কিছু বিষয়ও রাজবংশী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়। অনেক দেবদেবী ও মন্ত্রেরও সংযোজন ঘটে। বৌদ্ধিয় প্রভাবের চিহ্ন আজও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়। যেমন - জল্পেশ, বাণেশ্বরের শিব বৌদ্ধিয় মহাকাল আবার মদনমোহন মন্দিরের কালী বৌদ্ধিয় চামুণ্ডা কালী। এই চামুণ্ডা কালীকেই বৌদ্ধতন্ত্রে উগ্রতারা বলা হয়। অনেক প্রথা রীতি রাজবংশী সমাজ আজও অনুসরণ করে। মাতৃকা দেবীর প্রভাব রাজবংশী সমাজে আজও বিদ্যমান। মা কামাখ্যা দেবী তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বসুধা বা মেথিনী (মেদিনী) দেবীর পূজাও রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। সামগ্রিকভাবে 'গোসানীমঙ্গল' কাব্যে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয়াদি শুধু নয় ধর্মীয় ভাবনার বিষয়গুলিও আমরা পেয়ে যাই।

মৌলিক রচনার পরিসরে আমরা পেয়ে যাই আরেক লোক কবি রংপুর জেলার ইটাকুমারী

গ্রাম নিবাসী রতিরাম দাসের নাম। তিনি রচনা করেন জাগ গান। যা কানাই ধামালী বা কৃষ্ণ ধামালী হিসাবে সমধিক পরিচিত। কবি রতিরাম দাসের রচিত জাগ গান সংগ্রহ ও সংকলিত করে যাদবেশ্বর তর্করত্ন 'রঙ্গপুরের জাগ গান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। টীকা যোগ করে রাজবংশী সমাজের নবজাগরণের প্রধান পঞ্চানন সরকার (বর্মা) রংপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করেন ১৩১৫ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ)। যাদবেশ্বর তর্করত্ন যিনি তথাকথিত 'অশ্লীলতা দুষ্ট' এই গান ও পালাগুলিকে লোক সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ হিসাবে গণ্য করেছিলেন এবং সংগ্রহ করতে দ্বিধা করেননি। পঞ্চানন বর্মা যিনি টীকা যোগ করে এই গানগুলির সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক প্রতিবেশকে স্পষ্ট করে তুলেছিলেন।

জাগ গান বস্তুত জাগরণের গান, রাজবংশী সমাজের বাঁশ পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এটি মূলত ধর্মাচারের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও সমস্ত ব্যাপারটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আর্থ-সামাজিক কিছু অনুষঙ্গ। মদনকাম পূজার সূত্রেই জাগ গানের প্রচলন। মদনকাম বা প্রেমের উপাসনা হিসাবে এই পূজা গৃহীত হলেও অনুষ্ঠানটি আসলে অতিপ্রাচীন ধর্মীয় সংস্কারের বিবর্তিত রূপ ব্যতীত কিছু নয়।

রাজবংশী জনগোষ্ঠী ইন্দো-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর একটি শাখা। আদিম ধর্মবিশ্বাসে মূলত সর্বপ্রাণবাদে (animism) বিশ্বাসী। তাই বৃক্ষপূজার সঙ্গে নদী, পাহাড়-পর্বতকেও দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। মাটির ঢিপি কিংবা পাথরই দেবতার প্রতিভূ হয়ে ওঠে। মদনকামের অনুষ্ঠানে মূলত বাঁশের প্রতীকে পূজা করা হয়, বাঁশ এখানে মদনকামের প্রতীক। এই বাঁশ পূজার মাধ্যমে আদিম বৃক্ষপাসনা, যৌন প্রতীক অর্চনা, অশুভ অলৌকিক শক্তিকে প্রতিরোধ করা এবং রোগ-ব্যাধি দূর করা ইত্যাদি বিশ্বাস সংস্কারগুলির প্রচ্ছায়া নিহিত আছে। তাছাড়া ইন্দো-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী প্রথমত বাঁশের ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই তাদের জীবনচর্যার সঙ্গে বাঁশ শুধু অন্বিত নয় ধর্ম বিশ্বাস ও আচার-সংস্কারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। মদনকামের পূজা উর্বরাতন্ত্রের প্রতীক। বাঁশকে পুরুষ চিহ্নের প্রতীকে রাজবংশী সমাজের মদনকামের পূজা বিষয়টি সম্পূর্ণ আদিম সংস্কৃতির একটি দৃষ্টান্ত বটে। রাজবংশী সমাজে বাঁশ পূজার মাধ্যমে উর্বরতা ও সৃষ্টি সংশ্লিষ্ট বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যা আদিম কৌম সংস্কৃতির পরিচায়ক। যেমন সানি ঢাকের গানে উর্বরতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বস্তুত অতীতের প্রতিকূল পরিবেশে বংশবৃদ্ধির বিষয়টিকে

গুরুত্ব দেওয়া হত গোষ্ঠীবদ্ধতার শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। যা উর্বরতা সংস্কৃতির (Fertility Culture) পরিচায়ক। রাজবংশী সমাজে বাঁশ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্পদ কারণ বাঁশ দৈনন্দিন জীবনজীবিকার সর্বক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হত। সেটা বাড়িঘর থেকে কৃষিকার্য, ব্যবহার্য দ্রব্যাদি থেকে শিকারের যন্ত্রপাতি সবেতেই বাঁশের ব্যবহার। তাই প্রতীক রূপ বাদ দিয়ে ব্যবহারিক বিচারে বাঁশের গুরুত্ব ছিল অত্যধিক। স্বাভাবিকভাবে বাঁশ দেবতার প্রতীক হিসাবে রাজবংশী সমাজে গৃহীত হয়েছে। বাঁশকে ঘিরে বিভিন্ন সংস্কারও রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। অমাবস্যা-পূর্ণিমার দিনে কিংবা বৃহস্পতিবার বাঁশ কাটা যেমন নিষেধ তেমনি চৈত্র সংক্রান্তির দিন বাঁশের গোড়ার মাটি দেবার নিয়মও রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। প্রকৃতি ভাবনারও প্রতীক। আবার বাস্তুশাস্ত্রের সঙ্গেও অন্বিত। ‘‘পুবে হাঁস পশ্চিমে বাঁশ/উত্তরে গুয়া দক্ষিণে ধুয়া’’ অর্থাৎ পশ্চিমে বাঁশ বাগান থাকবে যাতে পশ্চিমী ঝড়কে প্রতিহত করে। জাগ গানের বিষয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা সম্পৃক্ত হয়েছে মানবিক জায়গা থেকে। স্বাভাবিকভাবে দৈনন্দিন জীবনের বিষয় ভাবনা অন্বিত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণ এখানে দেবদেবী নয়, মাটির মানুষ — গ্রাম্য যুবক-যুবতী। তাই কৃষ্ণ বড়শিতে মাছ ধরে ও রাধা শাক তোলে। রাজবংশী সমাজের ভাওয়াইয়া গানে তারই প্রভাব, গানের কানাই, কানু, কালার মধ্যে দেবত্বের চেয়ে মানব গুণের প্রকাশ। লক্ষণীয় বিষয় জাগ গানে শংকরীয় বৈষ্ণব ভাব নয় শ্রীচৈতন্যীয় বৈষ্ণব ভাবনারই প্রকাশ ঘটেছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন করেই মদনকামের গানগুলি রচিত হয়েছে এবং গানে উর্বরতা ভাবনাই প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যান্য দেবীর মত মদনকামের কাছেও তাই আর্তি ধ্বনিত হয়েছে —

‘‘ওরে নারীটার নাই ছাইলা, হায়রে নারীটা যদি মনচেৎ করিয়া ধরে,
হায়রে আটকুড়া নাম ঘুচিয়া যাইবে মদনকামের বরে।’’[৩৪]

জাগ গানে রাস পর্বে তৎকালীন সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার ছবিও ধরা পড়েছে। প্রতিবাদের ভাষাও উচ্চারিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এই কাব্যগানের মধ্যে থেকে একটা সময়ের সমাজ ও সংস্কৃতির আভাস পাই। রাজবংশী সমাজের দৈনন্দিন ভাব-বিভাব সহ ভাষা-শব্দ পেয়ে যাই। নিজের পরিচয় প্রদানের সাথে তিনি রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পরিচয়, উপবীত ধারণ, পুরাণ-শাস্ত্রাদি ইত্যাদির বিষয়গুলিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। নিজের জাতি ও দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা বর্ণনে তিনি গ্রামের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার নিপুণ

ছবি এঁকেছেন। ইংরেজ সরকার নিযুক্ত ইজারাদার দেবীসিংহের অত্যাচার, জমিদার শিবচন্দ্রের প্রজা বাৎসল্য ও দেবীসিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কারাবরণ ইত্যাদি বিষয়গুলিও তুলে ধরেছেন।

পেশা বৃত্তির বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কথা, বামুন, কায়েত, ধোপা, নাপিত, কুমোর, কামার, কৃষক, শ্রমিক, গোয়ালা, তাঁতি প্রভৃতি সকলকে নিয়ে গ্রামগুলির পারস্পরিক আত্মনির্ভরতার খবর দিয়েছেন। রাজবংশী, মুসলমানদের জমিদারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাও দিয়েছেন। মূলত কবি রতিরাম দাস তাঁর জাগ গানে কামরূপ, পৌণ্ড্রবর্ধন, কামতাপুর, কোচবিহার রাজ্যের অর্থাৎ ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও সেখানকার প্রধান জনগোষ্ঠী রাজবংশীদের ইতিহাসের সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন। কবি রতিরাম দাস ১৭৮১-৮২ খ্রিষ্টাব্দে রংপুরের ইজারাদার দেবীসিংহের খাজনা আদায়ে নির্মম অত্যাচারে প্রজা-কৃষককূলের নিদারুণ অবস্থার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন

কোম্পানীর আমলেতে রাজা দেবীসিং।
সে সময়ের মুল্লুকেতে হৈল বার ঢিং।।
কত যে খাজনা পাইবে তার নেকা নাই।
যত পারে তত নেয় আরো বলে চাই।।
দেও দেও চাই চাই এই মাত্র গেল।
মাইরের চোটেতে উঠে ক্রন্দনের রোল।।[৩৫]

১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকারের খাজনার হাত অত্যধিক বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে প্রজাকূলের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। ফতেপুরের জমিদার শিবচন্দ্র ও জমিদার জয় দুর্গা চৌধুরানী এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাকূলকে সংঘবদ্ধ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। প্রজাকূল সাধারণ অস্ত্র, কৃষিকার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। রংপুরের এই প্রজা বিদ্রোহ প্রথম বৃহত্তম কৃষক আন্দোলন এবং এই আন্দোলনই পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত হিসাবে কাজ করে। রতিরাম দাসের ‘জাগ গান’ নিছক কাম উদ্দীপনার গান নয় যথার্থই জাগরণের গান। তাই এই গানের ছত্রে ছত্রে ইতিহাস, ভূগোল, সময়কালের অবস্থান বর্ণিত হয়েছে নিখুঁত ভাবে। বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সমাজ জীবন, ধর্মীয় সংস্কৃতি, বোধ ভাবনার সঙ্গে প্রতিবাদী সংঘবদ্ধ চেতনার স্ফূরণ ঘটেছে। পরবর্তীকালের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের আভাসও

চিহ্নিত হয় কারণ তার পরেই রাজবংশী জনগোষ্ঠী জাতিসত্তার প্রশ্নে 'ক্ষত্রিয় আন্দোলন'-এ সংঘবদ্ধ হয় এবং যথার্থ জাগরণের মধ্য দিয়ে জাতি সংস্কার সাধনে উদ্যোগী হয়। নেতৃত্বে উঠে আসেন পঞ্চানন বর্মা এবং তার 'ক্ষত্রিয় সমিতি'। বলা যেতে পারে রাজবংশী সমাজের নবজাগরণ তথা সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সূচনাকাল সূচিত হয়।

লোক সাহিত্যের অন্যতম একটি শাখা হল গাথা বা গীতিকা। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় 'ময়নামতীর গান'-এর কথা। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন রংপুর থেকে গান, কবিতা, পাঁচালী সংগ্রহ করে 'মানিকচান্দ রাজার গান' নাম দিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশ করেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে আরও কিছু গান সংগ্রহ করে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ড. দীনেশ চন্দ্র সেন এবং বসন্তরঞ্জন রায় সংকলন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে 'গোপীচন্দ্রের গান' নাম দিয়ে প্রকাশ করে সাহিত্যের মর্যাদা দেন। এরপর ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনটি ভাগে প্রকাশিত হয় গোপীচন্দ্রের গান। এই গোপীচন্দ্রের গান মূলত নাথ ধর্ম সাধনার কথা — নাথ যোগীদের গান, ধর্ম প্রচারের কথা। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এই গান লোকসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হয় বিদ্বজ্জন-পণ্ডিতবর্গের উদ্যোগে। নাথ গীতিকার দুটি পর্যায় - একটি গোর্খনাথ মীননাথের কাহিনি অপরটি ময়নামতীর আখ্যান। তৎকালীন সমাজ সংস্কৃতির কথা। এই আখ্যানে যুক্ত হয়েছে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি তথা ধর্মীয় বিশ্বাসের কথা। রাজবংশী সমাজে এই ময়নামতীর গান 'যুগীর গান' হিসাবে পরিচিত। ড. দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে ময়নামতীর গানগুলিকে বৌদ্ধযুগের রচনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ময়নামতীর গানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ময়নাগুড়ি (জলপাইগুড়ি) এলাকার এবং অধিবাসীদের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা। উল্লেখ্য রাজবংশী সমাজে এখনও যুগীরা 'লাউয়ের বস' নিয়ে গান করে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে। অতীতে গান করা লোকের সংখ্যাটি উল্লেখযোগ্য থাকলেও বর্তমানে সংখ্যাটি হাতে গোনা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমুণ্ডি এলাকায় এখনও শোনা যায়। আবার ময়নাগুড়ি অঞ্চলের নামের সঙ্গে ময়নামতী মাও-র নাম আজও জনশ্রুতিতে জড়িয়ে আছে। রাজবংশী সাহিত্যের বিশেষ ব্যক্তিত্ব ধর্মনারায়ণ বর্মা উল্লেখ করেছেন যে ''ময়নামতীর গানত আমরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর কামতাপুরের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতি, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা জানির পাই।''[৩৬] ময়নামতীর গান বা যুগীর গানে তান্ত্রিক প্রভাবে

স্ফূর্তি লক্ষণীয়। সেইসঙ্গে গানটির ভাষা আধুনিক রাজবংশী, আরবী, ফারসী শব্দের উপস্থিতি মুসলমান প্রভাবকে সুস্পষ্ট করে —

ভাটী হাতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি
সেই বাঙ্গাল আসিয়া মুল্লুকত কৈলে কড়ি।
দেড় বুড়ি আছিল খাজানা তিন বুড়ি নিল,
রাম লক্ষণ দুইটা গোলা দুয়ারত বান্ধিল।

ময়নামতীর গানে অতীতের সামাজিক পরিস্থিতি উত্থাপিত হয়েছে। সমাজজীবনে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল। মানিকচন্দ্রের রাজ্যে প্রজাগণ যথেষ্টই শান্তিতে ছিল। জমির খাজনা ছিল এক হালে দেড় বুড়ি কড়ি। খেতে ধান শস্যের প্রাচুর্য ছিল। সেইজন্য প্রজাগণ ''আথাইলের ধান করি পাথাইলে শুকায়। সোনার ভাটা দিয়া রাইওয়াতের ছাওয়ালে খেলায়।''[৩৭] এই অবস্থার পরিবর্তন হয় রাজকার্যে বাঙাল (পাঠান) দের আগমনে। খাজনার ভারে দেশের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। ময়নামতীর গানে ত্রয়োদশ শতকের সমাজজীবনের ছবিটা স্পষ্ট হয়। বাংলা তথা উত্তরবঙ্গে মুসলমান শাসকদের আগমনকেও চিহ্নিত করে। যা সাংস্কৃতিক বিবর্তনকেও ত্বরান্বিত করে সেইসঙ্গে সমন্বয়ের বিষয়টিকেও নির্দেশ করে। যার জন্য ময়নামতীর গানেও আরবী, ফারসী শব্দের সমাহার ঘটে। ময়নামতীর গান, কথা, গল্প-গাঁথা রাজবংশী সমাজে বহুল প্রচলিত। ময়নামতী গানের বহু ছড়া শ্লোক আজও শোনা যায়। নাথ গীতিকার দুটি আখ্যানেই রাজবংশী ভাষার বাগ্‌ভঙ্গি, রচনা রীতি এবং উপযুক্ত ভাব প্রকাশের বাহনরূপে প্রচুর শব্দের ব্যবহারে ধর্মীয় বোধ ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। আবার গোর্খবিজয়ের গানের সঙ্গে রাজবংশী সমাজে প্রচলিত গোরখনাথের গান অর্থাৎ গোন্নাথ মাগার গানও সংশ্লিষ্ট। সেখানেও রাজবংশী সমাজ জীবনের সামগ্রিক চিত্র ধরা পড়েছে। এইসব ছড়া, প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে রাজবংশী সমাজের সমাজ ভাবনা তথা তৎকালীন সময়কালের মনন চেতনারও ছবি ধরা পড়ে। ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে ''উত্তরবঙ্গের কৃষক সমাজে রাজা গোপীচন্দ্র ও তাঁর মাতা রাণী ময়নামতীর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী, ছড়া, পাঁচালী আকারে এখনও প্রচলিত।''[৩৮] যেখানে মধ্যযুগের স্থানীয় রাজবংশী সমাজের সমাজ চিত্র ধরা পড়েছে। স্বাভাবিকভাবে সুদূর অতীতে রাজবংশী সমাজ জীবনের ছবি সহ সংস্কৃতির পরিচয়ও ধরা পড়েছে ময়নামতীর গানে।

যা রাজবংশী সমাজের সমাজ ও সংস্কৃতি বিবর্তনের পর্যালোচনায় গুরুত্বপূর্ণ।

মধ্যযুগে রাজবংশী ভাষায় রচিত লোকসাহিত্যের উপাদানগুলিতে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সমাজ জীবনের ছবি, সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়েছে। ছাওয়া ভুর্কা ছড়া অর্থাৎ শিশু ভুলানো ছড়া, হেঁয়ালি বা ধাঁধা (যা রাজবংশী সমাজে ছিলকা, ফাকিরি হিসাবে পরিচিত), শিল্লুক, শিলুক অর্থাৎ প্রবাদ-প্রবচন, রসিকতা, গীতি-গীতিকা সর্বোপরি লোকসঙ্গীত ইত্যাদির রচনা রীতি বাগ্‌বৈগদ্ধতা শুধুমাত্র রাজবংশী ভাষার বিশিষ্টতার ক্ষেত্রে ও বিষয় ভাবনার মধ্যে সমাজ মননের গভীরতাও প্রকাশ পায়। ছড়া, ধাঁধায় রাজবংশী সমাজের জ্ঞানদীপ্ত সহজ সরল জীবন ভাবনার সঙ্গে জীবন রসের পরিচয় বহন করে। আবার পরিশীলিত মননবোধের বিষয়টিকেও প্রতিষ্ঠিত করে। প্রবাদ-প্রবচন একটি জাতির সুদীর্ঘকালের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয়কে বহন করে। রাজবংশী সমাজের প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে বিষয়-ঘটনা-অভিজ্ঞতার সমন্বয় শুধু নয় কল্পনা ও মেধাশক্তির পরিচয়ও নিষিক্ত হয়েছে। সেইসঙ্গে রাজবংশী সমাজের নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় শিল্পভাবনার বিষয়গুলি সম্পৃক্ত হয়েছে। আধুনিক যুগেও এই প্রবাদ-প্রবচনগুলির প্রাসঙ্গিকতা বিদ্যমান। এখনও গ্রামের বয়স্করা কথায়-কথায় প্রবাদ বলেন। 'বাপের থাকি ব্যাটা সিয়ান, পুছি পুছি নেয় গিয়ান' (শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে অনুসন্ধিৎসা থাকলেই জ্ঞান লাভ সম্ভব)। কিংবা 'কাচাতে না নোঙালে বাঁশ, পাইকলে করে টাস্ টাস্' অর্থাৎ সময়ের কাজ সময়ে করা দরকার, এরকমই সুখে দুঃখে অবিচল থাকার প্রসঙ্গে 'অধিকো ধনী হয়া না হই চিতোর/অধিকো কাঙ্গাল হয়া না হই কাতোর।'

এরকম অজস্র প্রবাদে রাজবংশী কথা শুধু আকর্ষণীয়, চিত্তাকর্ষকই শুধু নয় অর্থবোধে গভীর ও ব্যঞ্জনাময় হয়ে সমৃদ্ধতর। ভাষা বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও পরবর্তীকালে রাজবংশী ভাষার ক্ষেত্রে পরিবর্তন চোখে পড়ার মত। বর্ণহিন্দুদের প্রভাবে শুধু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নয় ভাষার ক্ষেত্রেই সবচাইতে বেশি পরিবর্তন ঘটেছে। ভাষার গৌরব অনেকক্ষেত্রেই অস্তমান। বর্তমান প্রজন্মের বেশিরভাগই আজকে এই ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন, যা অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বিবর্তনকেই সূচিত করে।

রাজবংশী সমাজের লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডারটি তো সুবিশাল। পূজা-পার্বণভিত্তিক অজস্র গানের পাশাপাশি তথাকথিত ভাওয়াইয়া গানে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনচর্যা, সমাজ-

ধর্ম, অর্থনীতি সবই ধরা পড়েছে। প্রকৃতির নিবিষ্টতার পাশাপাশি ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া, সুখ-দুঃখ, পেশা-বৃত্তির যন্ত্রণা সমস্ত কিছুই ভাওয়াইয়া গানে উচ্চারিত হয়েছে। প্রতিবাদ, ক্ষোভ-বিক্ষোভ, আহ্বান, উত্তরণের কথাও ধ্বনিত হয়েছে। মূলত ভাওয়াইয়া গানের মধ্যেই রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয়, প্রতিবেশ, অবস্থান, অতীত-বর্তমান পরিস্ফুট হয়। পূজা-পার্বণ-এর গানে যেমন ধর্মীয় বৃত্ত, সংস্কৃতি, বিশ্বাস-ভাবনার প্রকাশ ঘটে, লোকায়ত বৃত্তের বলয়টিকেও চিহ্নিত করে। এই ভাওয়াইয়া সংস্কৃতির মধ্যেই রাজবংশী সমাজের গোষ্ঠী পরিচয়, উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাত, লড়াই-সংঘাত সহ বর্তমান অবস্থার বিবর্তনের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটেছে। ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে বৌদ্ধিয় প্রভাব যেমন পড়েছে তেমনি বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বিপুলভাবে পড়েছে। কিন্তু লোকায়ত ভাবনায় দেবদেবীরাও মানবিক হয়ে উঠেছে ভাওয়াইয়ার গান ও কথায়। ভাওয়াইয়া গানের মধ্যেই সাংস্কৃতিক পথ পরিক্রমণের একটি ধারাভাষ্য আমরা পেয়ে যাই। সেখানে সমাজ অর্থনীতির বিষয়গুলির ছায়াপাতও ঘটেছে সুর, কথা ও ব্যঞ্জনায়। আধুনিকতার বিচারেও ভাওয়াইয়া সঙ্গীত যুগোপযোগী। সময়কালের বিষয় তাই অনুষঙ্গগুলিকে ধারণ করেছে। আবার রাজবংশী সমাজের মননদর্শন বোধবীক্ষাকেও ভাওয়াইয়ার সুরে প্রতিফলিত করেছে — তাই তো আজকের সময়ে রচিত ভাওয়াইয়া গানেও ধ্বনিত হয়।

রাজবংশী সমাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসঙ্গে বাড়ে বাড়ে রাজবংশী সমাজের নবজাগরণের প্রাণপুরুষ মনীষী পঞ্চানন বর্মার নামটি আসে। তিনি রংপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন হয় ছড়া, কবিতা, প্রবাদ, গান, পাঁচালী সংগ্রহ করা ও প্রকাশের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নিজেও কবিতা, প্রবন্ধ রচনার মধ্যে দিয়ে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সুসংঘবদ্ধ ও সচেতন করার বিষয়ে প্রয়াসী হন। ক্ষত্রিয়করণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজ সংস্কারের বিষয়টি তো ছিলই। স্বাভাবিকভাবে বলা যায় তিনি রাজবংশী ভাষায় (তিনি অবশ্য রাজবংশী ভাষাকে ‘কামতা বিহারী’ ভাষা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন) সাহিত্য-সৃজনের ক্ষেত্রেও নবযুগের সূচনা করেছেন। সমাজ সংস্কারের হাত ধরে রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার পাশাপাশি শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রসারে তিনি প্রথমাবধি অভ্যস্ত সচেতন ছিলেন। তারই জনশ্রুতিতে ছয়-এর দশকে রাজবংশী ভাষায় সাহিত্য সৃজনের স্বতন্ত্র একটি ধারার সৃষ্টি হয়। কোচ-রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুবাদ

সাহিত্যচর্চার ধারায় যেমন ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রসার ঘটে তেমনি পঞ্চানন বর্মার এই উদ্যোগে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি নবতম ধারার সংযোজন ঘটে। যদিও রতিরাম দাসের 'জাগ গান'-এ রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে কিংবা রাঁধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগীর 'গোসানীমঙ্গল' কাব্যে কিন্তু রাজবংশী ভাষায় সাহিত্য সৃজনের ধারায় ব্যক্তিগত ভাবনা চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যা রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ভাষ্যলিপি হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার সময় পর্বে সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজবংশী সমাজের মননদর্শন, চেতনাবোধ তথা শ্রেণি চেতনার উন্মেষ ঘটে। প্রতিফলন ঘটেছে রাজবংশী গল্প, কবিতা, উপন্যাসে। পরিসরটি বিস্তৃত না হলেও স্বাধীনোত্তর সময়পর্বের এই সাহিত্য সৃজনে আত্ম পরিচয়ের সংকট, ক্ষোভ-বিক্ষোভ, চাওয়া-পাওয়া, দাবি-আন্দোলন, সমাজ রাষ্ট্রের ভূমিকা, সামগ্রিক অবস্থান, সম্ভাবনা, উত্তরণের অভীপ্সা সবকিছুই সাহিত্যে প্রতিফলিত থাকে। স্বাভাবিকভাবে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পট পরিবর্তন বিষয়টি লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। কবিতা, গল্পে আধুনিকতা অনুসরণের সাথে উত্তর আধুনিক চেতনাবোধ, বোধবীক্ষার অভিক্ষেপ সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। সাহিত্যেই প্রতিফলিত হতে থাকে জাতিসত্তার কথা, অবস্থানের কথা, ক্ষোভ-বঞ্চনার কথা, দাবি-আন্দোলনের কথা এবং সর্বোপরি সংস্কৃতির কথা। লিখিত সাহিত্য বিস্তৃত হতে থাকে। আত্ম সচেতনতার প্রকাশ ঘটতে থাকে। ছয়-সাতের দশক থেকে রাজবংশী সমাজের এই সাংস্কৃতিক বিবর্তন অবশ্যই উল্লেখ্য কারণ একটি জাতি-গোষ্ঠী ধারাবাহিকভাবে উত্তরণের মধ্য দিয়ে আধুনিক সময়ের শরিক হয়ে ওঠে। অনেক গ্রহণ-বর্জন-আত্তীকরণের মধ্যে দিয়ে ধাপে ধাপে এই জায়গায় পৌঁছয় এবং মৌখিক সাহিত্য লিখিত সাহিত্যের রূপ পায়। যা সাংস্কৃতিক বিবর্তনের অনুষঙ্গ হিসাবেই বিষয়টি সূচিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু উপন্যাস ও গল্পে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয়গুলি সময় প্রেক্ষিতে গ্রন্থিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় অমিয়ভূষণ মজুমদারের নাম। তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাসে রাজবংশী সমাজ জীবনকে আখ্যান করে রচিত হয়েছে। তবে তাঁর উপন্যাসে প্রতিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তিনি সময়কে ধরেছেন ব্যাখানে চরিত্রগুলিকে আধার করে। তাঁর 'দুখিয়ার কুঠি' ও 'মহিষকুড়ার উপকথা' উপন্যাস দুটি মূলত উত্তরবঙ্গের প্রান্তবর্তী এলাকাকে ভিত্তি করে এতদঞ্চলের রাজবংশী সমাজ

জীবন প্রাধান্য পেয়েছে। অমিয়ভূষণ মজুমদার ইতিহাস চেতনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন নিয়ত নির্মাণ-বিনির্মাণ করেছেন। উত্তরবঙ্গের প্রান্তবর্তী আরণ্যক জীবনে আধুনিকতার আগ্রাসন, অরণ্য ধ্বংস, আধুনিকতার হাতছানি, আদি কৌম চরিত্রের বিক্ষেপ প্রকৃতিকে চরিত্রের দ্বন্দ্বে প্রস্ফুটিত করেছেন। সভ্যতার অগ্রগতি, যোগাযোগ স্থাপন, জীবনধারায়, জীবিকা নির্বাহ প্রণালীর রূপান্তরে মাতালুর মত মানুষের 'ফান্দৎ পড়া', শান্ত নিঃস্তরঙ্গ জীবনে গতির প্রবেশে মানবিক সংকটকে ভিন্ন মাত্রায় ধরেছেন লেখক অমিয়ভূষণ মজুমদার। অনেকটা সময় এগিয়ে কোচবিহারের এক প্রান্তীয় গদাধর এলাকার জনজীবনের সামগ্রিক পরিবর্তনকে তিনি উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন। পোষাকের পরিবর্তন, বিনিময় — সমাজ পদ্ধতির পরিবর্তন, আধুনিকতার প্রতি মোহ, লোভ-আকর্ষণে চরিত্র-আচরণের বদলের মধ্য দিয়ে সময়কে ধরেছেন। আধুনিকতা সভ্যতার নানাবিধ উপসর্গ গ্রাম জীবনে অন্তর্ভুক্ত হয়। ঠগ-মাফিয়া শ্রেণির উদ্ভব হয়। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। ভাইয়ে-ভাইয়ে মামলা মোকদ্দমা, লখাই চক্রবর্তীর মত চোরাকারবারীর আগমন, অবিশ্বাস, ভয়ের জন্ম হয়। শান্ত-সরল জীবনে জটিলতার আগমন ঘটে। চিরায়ত জীবনযাপনের পরিবর্তনে কৌম চরিত্র ক্ষতবিক্ষত হয়।

'দুখিয়ার কুঠি' উপন্যাসের মূল উপজীব্য পাকা সড়ক নির্মাণ করে যোগাযোগ স্থাপন, গ্রামীণ প্রকৃতি সন্নিবেশ জীবনে আধুনিকতার প্রবেশ, জটিলতার বিস্তার, উপসর্গের আমদানি, কৌম জীবনচর্যার পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়গুলি পারস্পরিক হয়ে ওঠে। সভ্যতার সংস্পর্শে প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর লোকায়ত ভুবন, জীবনচর্চার প্রতিবেশ এক লহমায় পাল্টে যায়। নতুন সংকটে আবর্তিত হতে শুরু করে সমাজ জীবন। এই উপন্যাসের বিস্তারে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে মূলত রাজবংশী সমাজজীবনই আলোকিত হয়েছে। ঘটনার বিন্যাসে সময়কালটি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই সময়ে যোগাযোগ স্থাপন, অরণ্য ধ্বংস, রিজার্ভ ফরেস্ট তৈরি করে অরণ্যের অধিকার হরণ, ব্রিটিশ সরকারের চূড়ান্ত উপস্থিতি, তাদের বিভিন্ন আইন কানুন প্রণয়ন, জমি জরিপ ও রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন, সরকারি দাক্ষিণ্যে কিছু মানুষের বিত্তশালী হয়ে ওঠা আবার কিছু মানুষের অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন অভিবাসী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, আদি অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব নতুন এক সন্ধিক্ষণের জন্ম দেয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পরিস্থিতি তৈরি হয়। জীবন-জীবিকা থেকে পরিবেশ, সামাজিক ব্যবস্থা, মনন বোধ ভাবনা সবেতেই এই

পরিবর্তন সক্রিয় হয়ে ওঠে। বস্তুত এই উপন্যাসের বিস্তার ও ঘটনা বিন্যাসে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের এক বিবরণ পেয়ে যাই। সময়কালের নিরীক্ষণে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কালে ব্রিটিশদের আগমনে এতদঞ্চলের কৌম জনগোষ্ঠী রাজবংশী সমাজের ধারাবাহিক পরিবর্তনের বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়। তাঁর 'মহিষকুড়ার উপকথা' উপন্যাসেও রাজবংশী সমাজজীবন প্রাধান্য পেয়েছে। নস্য শেখ মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিকে চরিত্রে চিত্রণ করে রাজবংশী সমাজের পরিবর্তনকেই চিহ্নিত করেছেন। অরণ্য ধ্বংস করে সভ্যতার বিকাশ — জাফরুল্লার আগ্রাসী ক্ষমতা বিস্তার সরকারি লোকজনের সঙ্গে যোগসাজস করে 'পায়োর' (পাওয়ার) বৃদ্ধি — তার পঞ্চায়েত হয়ে সামন্ততন্ত্রের প্রতীক হয়ে ওঠা। বন্য পশু মোষকে নিয়ন্ত্রণ করার মত আসকাফকে নিয়ন্ত্রণ করা — ব্যক্তি বনাম ব্যক্তি সমাজ প্রকৃতির দ্বন্দ্ব। প্রকৃতি বনচারী মানুষ ও পশুর পাশাপাশি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা উপনিবেশ-নগর-যন্ত্র-সভ্যতা-পঞ্চায়েত নির্বাচন-সরকারি অফিসারদের যোগসাজস ইত্যাদি বিষয়ের সংস্থাপনে সভ্যতার সংকট প্রকৃতির কোলে নিরিবিলি থাকা কৌম চরিত্রগুলির পরিবর্তনকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হিসাবে চিহ্নিত করে যেটা আসকাফের মননভঙ্গিতে বিশ্লেষিত হয়েছে। সে জাফরুল্লার ব্যাপারির ক্ষমতা বুঝতে পারে — মোষের বদলে যন্ত্র দানব ট্রাকের মধ্যে সে বুঝে যায় পরিবর্তনের ঝড়। পরাজিত আসকাফের 'অ্যাঁ-আঁড়' শব্দে ক্ষোভ উচ্চারিত হলেও সে মেনে নিতে বাধ্য হয়। এখানেই পরিবর্তনকে মেনে নেওয়া, শিরোধার্য করে নেওয়া। আসকাফ নিতান্তই উত্তরবঙ্গ তথা প্রান্তীয় কোচবিহার এলাকার কৌম জনজাতির প্রতিনিধি। ভাষা ব্যবহারে রাজবংশী সমাজের প্রতিনিধিত্বই সে করছে। ঘটনার বিস্তারে মুঘল-তাতার-তুর্কীদের আগমনের ইতিহাস আছে, আছে মীর জুমলার প্রসঙ্গ। ইংরেজ সরকারের পদচারণাও ঘোষিত হয়েছে স্বাভাবিক এতদঞ্চলের কয়েকশ বছরের ধারাবাহিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যানই উপন্যাসের পর্যায়ে ধরা পড়েছে। সেইসঙ্গে এতদঞ্চলের নস্য শেখ মুসলমান সম্প্রদায় তথা বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক বিবর্তনের আখ্যানও বর্ণিত হয়েছে। আমরা পেয়ে যাই সাংস্কৃতিক বিবর্তনের কালক্রম, হেতু এবং পর্যায়ক্রম। ইতিহাস-ভূগোলের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিবর্তন যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তা প্রকৃতি পরিবেশের পরিবর্তনে ধরা পড়েছে। জগৎ ও জীবনের রূপকে অঙ্কন করতে গিয়ে অমিয়ভূষণ মজুমদার কৌম রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মনন জগৎ তথা সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ছবিটিকেও সুন্দরভাবে

এঁকেছেন।

দেবেশ রায়ের তিন তিনটি উপন্যাসে (মফঃস্বলি বৃত্তান্ত, তিস্তা পুরাণ ও তিস্তাপারের বৃত্তান্ত) স্পষ্টতই তিনি রাজবংশী সমাজ জীবনের ছবি এঁকেছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের রাজবংশী সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি তিনি বিষয় ঘটনার বিস্তারে তুলে ধরেছেন। তিনটি উপন্যাসেই বর্ণিত হয়েছে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশীদের সমাজ জীবন সংস্কৃতির কথা। মফঃস্বলি বৃত্তান্ত, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত দুটি উপন্যাসেই জোতদার-আধিয়ারদের কথা এসেছে। ভূমি সংস্কার আইনে সর্বস্বান্ত হওয়া, খাস জমির প্রসঙ্গ এসেছে। তিস্তা পুরাণে রাজবংশী সমাজ জীবন সংস্কৃতি বিবরণ তিনি বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। বাড়িঘরের বর্ণনা থেকে ডারিঘর, ঠাকুরবাড়ি, খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, লোকায়ত সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় সেইসঙ্গে সমবায়িক মানসিকতার 'হাউলি' যাওয়ার বিষয়টি তিনি তুলে ধরেছেন। আবার সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিভিন্ন পেশা বৃত্তি গাড়িয়াল মৈষাল-মাহুতদের কথাও তুলে ধরেছেন। বৃত্তিগত দিক থেকে পান -সুপারি বেচা, কলা বেচা, গুয়া সবকিছুই তিনি ব্যাখানে তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী রাজবংশী সমাজ জীবনের ছবি পাওয়া যায়। আর্থ-সামাজিক কাঠামো থেকে লোকায়ত বৃত্ত সেইসঙ্গে অভিবাসী মানুষের আগমনে সমাজ জীবনের পরিবর্তনের বিষয়গুলি তিনি সুন্দরভাবে বর্ণনায় তুলে ধরেছেন। ভূমি সংস্কার, অপারেশন বর্গা, তেভাগা আন্দোলন কোন কিছুই বাদ যায়নি। তার ফলে রাজবংশী সমাজ জীবনে অভিঘাত ক্ষোভ-বিক্ষোভের কথা সবই তিনি বিষয় প্রেক্ষাপটে আলোচনায় স্থাপিত করেছেন। স্বাভাবিকভাবে স্বাধীনোত্তর পরবর্তী কয়েক দশকে আর্থ-সামাজিক কাঠামো বদলানোর সঙ্গে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি পরিবর্তনের বিষয়টিকে অনুধাবন করা যায়। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী কয়েক দশক আগে রাজবংশী সমাজ জীবনের সংকট এবং সেইহেতু পরিবর্তনের পর্যায়ক্রম বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্যক পূর্বাভাস তার উপন্যাসে পাওয়া যায়।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসে যেমন আরণ্যক সমাজ সংস্কৃতির পরিবর্তনের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে তেমনি অরণ্য ধ্বংস, কৃষিজমির সম্প্রসারণ, সেটেলমেন্ট ব্যবস্থা, সরকারি আইনকানুন-বিধিব্যবস্থা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, যোগাযোগ স্থাপন, আধুনিকতার আগমন, শান্ত-সরল মানুষের মধ্যে জিজ্ঞাসা দ্বন্দ্বের বিষয়গুলি উত্থাপন করে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর আর্থ-

সামাজিক সাংস্কৃতিক কাঠামো তথা সমাজ সংস্কৃতির বিষয়টি তুলে ধরেছেন। সামন্ততান্ত্রিক আগ্রাসনের বিষয়টিও তিনি আখ্যানে ধরেছেন।

দেবেশ রায়ের অনেক গল্পে রাজবংশী মানুষ ও সমাজ জীবনের কথাই ধরা পড়েছে। 'লাঙ্গল যার জমি তার' ভাবনা প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর 'দখল' গল্পে। সেখানে প্রজাসত্ত্ব আইন পাশ হওয়ার ফলে অনেক আধিয়ার ভূমিহীন হয়ে পড়ে। সেই ভূমিহীনতার সংকটে রাজবংশী সমাজ জীবনের সমস্যা গল্পে উপজীব্য হয়েছে। 'বানা' গল্পে যেমন নদী নির্ভরতা কিভাবে অনেককে সর্বস্বান্ত করে দেয় তার আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। 'রাখী পূর্ণিমার রাত' গল্পে যেমন রাজনৈতিক নগ্নতার প্রকাশ ঘটেছে। দলীয় স্বার্থে কিছু মানুষের অসহায়তা সেখানেও রাজবংশী বুধারুর মত মানুষের কাহিনি বিবৃত হয়েছে। তিস্তা নদীকে উপজীব্য করে গল্প 'অনৈতিহাসিক'-এ মানুষের উদ্বাস্তু হওয়ার করুণ কাহিনি, ছিন্নমূল হয়ে ভেসে যাওয়ার কাহিনি। 'মূর্তির মানুষ' গল্পটিতে তিনি গ্রাম্য লোকশিল্পীর টটাই-র উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন রাজবংশী সমাজ সম্পর্কে নাগরিক সমাজের ধারণাকে তির্যকভাবে উপস্থাপন করে ব্যঙ্গ করেছেন। এভাবেই তাঁর অন্যান্য গল্প 'জোত জমি', 'গীতাল যুগীনের টেকনোলজি গ্রহণ' রাজবংশী জীবন যন্ত্রণার বিষয়গুলিকে তিনি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চিহ্নিত করে ভূমিচ্যুত রাজবংশী মানুষের সাংস্কৃতিক সংকটের বিষয়টির উপর জোরালো আলোকপাত করেছেন।

দেবেশ রায় মূলত বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী পর্বের জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির সংকটকে তাঁর আখ্যান বিশ্বে তুলে ধরেছেন। সেখানে রাজবংশী সমাজ জীবন সংস্কৃতি অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। অভিবাসন সমস্যা, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সম্পর্কের বিন্যাস, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সরকারি বিভিন্ন আইনকানুন, সমাজ অর্থনীতির নতুন সমীকরণে এতদঞ্চলের কিছু মানুষের করুণ অবস্থাকে তিনি যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি সামন্ততান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াই-র আভাসও দিয়েছেন। আবার কিছু মানুষের সমাজ পরিস্থিতির বাস্তবতায় ক্রিড়ানকে পরিণত হওয়ার বিষয়টিকেও ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর গল্প উপন্যাসে জলপাইগুড়ি এলাকায় ৬৮ সালের বন্যা, প্রজাসত্ত্ব আইন, বর্গা অপারেশন, নকশাল আন্দোলন, ভোট জমি দখল, তিস্তার বাঁধ, জোতদার আধিয়ার সম্পর্কের বিন্যাস, অভিবাসী মানুষের চাপ, ভূমিচ্যুত হওয়া রাজবংশী কৃষক সমাজ সংস্কৃতির সংকট। ক্ষোভ-বিক্ষোভ-লড়াই মনস্তাত্ত্বিক

দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তুলে ধরে সময়কালের নিরিখে সমাজ সংস্কৃতির বিবরণের বৃত্তান্তকেই লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা তাঁর আহ্বান বিশ্ব থেকে স্বাধীনতার আগে ও পরের কয়েক দশকের সমাজ সংস্কৃতির বিবর্তনের কারণ, যুক্তি ও অবস্থানকে অনায়াসে চিহ্নিত করতে পারি।

আরও বেশ কিছু লেখকের লেখনীতে সমাজ, সংস্কৃতি ও বিবর্তনের কথা ধরা পড়েছে। পীযূষ ভট্টাচর্যের ‘বোধন পর্ব’ গল্পে যেমন বাংকার-এর চালাক হওয়ার বিষয়টি বোঝা যায় তেমনি বর্গা অপারেশন, তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত পরিস্থিতি, সম্পর্কের অবনতি, সংকট এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বিষয়গুলি ধরা পড়ে। বিপুল দাসের ‘লাল বল’ উপন্যাসেও এই বিষয়গুলি ছায়াপাত হয়ে উত্তরবঙ্গের জনজীবনে রাজবংশী সমাজ জীবনের সংকট-পরিস্থিতি, আধিপত্যহীনতা উত্তরণের বিষয়ভাবনাগুলি চরিত্রের কাঠামোয় যুক্ত হয়ে আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের ছবিটি ধরা পড়েছে। অভিজিৎ সেনের ‘দেবাংশী’ গল্পে যেমন কৌম জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, সংস্কার সেই সঙ্গে পাঁচ-ছয় দশকে সহজ-সরল রাজবংশী মানুষের দাবি আদায়ে সোচ্চার হওয়ার বিষয়টি উঠে আসে তেমনি সামন্ততান্ত্রিকতার কায়েমী স্বার্থের বিচ্ছেদ, সংঘবদ্ধ লড়াইয়ের পাশাপাশি ধর্মীয় সংস্কার-বিশ্বাসেও সচেতনতার আভাস ধরা পড়েছে। মানবিক দ্বন্দ্বের অবকাশে উত্তরণের পথ ধরে দেবাংশী হয়ে ওঠে পুরোহিত নয় যুগ পরিবর্তনের যুগ পুরুষ। যা রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনেরই আখ্যান হিসাবে প্রতিপন্ন হয়।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে রাজবংশী সমাজে মাশানকে ঘিরে ভয় সংস্কার সেই সঙ্গে তন্ত্র মন্ত্র, তুকতাক, দেউসী, ভৌরিয়াদের আধিপত্য, ধান্দাবাজি ইত্যাদি বিষয়গুলি উঠে এসেছে। পাশাপাশি নাগরিক সভ্যতার আগমন, উপনিবেশিক জীবন, পরিবর্তমান সময় পরিস্থিতির উদ্ভূত সমস্যা, ক্ষোভ-বিক্ষোভ, জঙ্গী আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতি সংকট ও অপসৃয়মানতাকে আখ্যানে বিস্তৃত করেছেন। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রাজবংশী সমাজের সামগ্রিক বিবর্তনের ছবিটিকে তিনি পক্ষান্তরে তুলে ধরেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে ড. চারুচন্দ্র সান্যালের ‘দ্য রাজবংশীস অব নর্থবেঙ্গল’ গ্রন্থটির উল্লেখ করতে হয়। সাংস্কৃতিক বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এই গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শুধু নয় আকরগ্রন্থও বটে। কারণ তিনি এই গ্রন্থে নৃ-তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের সামগ্রিক জীবন ও সংস্কৃতির যাবতীয় বিষয়গুলিকে ক্ষেত্র সমীক্ষার ভিত্তিতে গ্রন্থিবদ্ধ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে

পরবর্তী সময়কালের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পর্যালোচনায় গ্রন্থটির বিষয়বস্তু অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে। পাশাপাশি নাম করতে হয় উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনগোষ্ঠীর আরেক কৃতীপুত্র উপেন্দ্রনাথ বর্মনের নাম, তাঁর 'উত্তর-বাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজবংশী সমাজ জীবন, অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থা, ব্যবসা বাণিজ্য, পারস্পরিক সম্পর্ক, মেলা-উৎসব, জীবন-জীবিকার যাবতীয় বিষয়গুলি ধরা পড়েছে অভিজ্ঞতা ও চোখে দেখার ভিত্তিতে। জীবন্ত উপাদান হিসাবে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গিরিজাশংকর রায়ের 'উত্তরবঙ্গের ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ' গ্রন্থটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিংশ শতাব্দীর রাজবংশী সমাজের দেবদেবী, পূজা-পার্বণ, তথা ধর্মীয় প্রভাব ও সংস্কৃতির বিষয়গুলি আখ্যায়িত হয়েছে। যার অনেকগুলি পরবর্তীকালে অপসৃয়মান হয়েছে। আর্থ-সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লোকসাহিত্যের সংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) এবং উপেন্দ্রনাথ বর্মনের 'রাজবংশী ভাষায় প্রবাদ-প্রবচন ও হেঁয়ালী' গ্রন্থগুলিও রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির পর্যালোচনায় গুরুত্বপূর্ণ দলিল। কারণ সেইসব প্রবাদ-প্রবচন, ছিল্কা, ছড়াগুলি পরবর্তী সময়কালে বেশিরভাগই হারিয়ে যায়। সাংস্কৃতিক বিবর্তনের প্রেক্ষিতে সে বিষয়গুলি আলোচনার নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ।

পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর ছয়-সাত দশকে রাজবংশী ভাষা সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। বেশ কিছু লেখক- লেখিকা কবি-সাহিত্যিক গল্প, উপন্যাস, কবিতা রচনায় উদ্যোগী হন। সে-সব গল্প, উপন্যাসে ধরা পড়তে থাকে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির কথা, মননভাবনা, স্মৃতিচারণা সেইসঙ্গে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অভিঘাত অতীত গৌরব, জাতিসত্তার কথা। উপন্যাসে ধরা পড়েছে বঞ্চনার কথা, ক্ষোভের কথা, প্রতিবাদ-আন্দোলন, জঙ্গি হয়ে ওঠা ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে মূলত এই সময়কালের উদ্ভূত সমাজ অর্থনীতির প্রেক্ষিতে। রাজবংশী জনমানসের ছবি ধরা পড়ে উপন্যাসের বিস্তারে। সেটা ভগীরথ দাসের 'সেন্দুকের ছোড়ানি' কিংবা তারামোহন অধিকারীর 'আসামী' উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়। অতীত গৌরবের কথা, কোচ-রাজার কথা, পরবর্তী সময়ে জমি হারানোর দুঃখ, আধিপত্যহীনতা, অভিবাসনের চাপ, বর্ণহিন্দুদের বিদ্বেষ, তাদের লোভ-লালসা ইত্যাদি বিষয়গুলি উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক আগ্রাসন, ভাষার দাবি, জাতিসত্তার সংকট, সমাজ সংস্কৃতির সংকট ইত্যাদি বিষয়গুলি উত্থাপন করে রাজবংশী জনজীবনের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। পরেশ চন্দ্র রায়ের 'বাতাসীর বাসিয়া

কাথা' উপন্যাসে যেমন রাজবংশী জীবন-জীবিকার প্রসঙ্গে রাজবংশী মানুষের সহজ-সরলতা বিপ্রতীপে ধান্দাবাজি ধূর্ত হয়ে দালালি করার বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। আদপে অভিবাসনের চাপে, ভূমিচ্যুত হয়ে, সমাজ সংস্কৃতি বিবর্তনের হাত ধরে যেকোন পেশায় যুক্ত হওয়ার পরিস্থিতিকে তুলে ধরেছেন। পেনকেটু, খইরুল চরিত্রের মধ্য দিয়ে আট-নয়ের দশকে রাজবংশী মানুষের জীবন-জীবিকার প্রশ্নে সংকট এবং পরিবর্তনকে নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন উপন্যাসের কাহিনি বিস্তারে। সমাজ অর্থনীতি পরিবর্তনের ছবিটিকে তিনি বাস্তব করে ধরেছেন। যা রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির বিবর্তনকে সূচিত করে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে স্বাধীনোত্তর সময়কালের কয়েক দশকের মধ্যে রাজবংশী সমাজ বিন্যাস, অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়। অভিবাসনের চাপে শহরের বিস্তার, আধিপত্যহীনতা, বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা সেই সঙ্গে ভূমিচ্যুত হয়ে কিছু মানুষের গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যাওয়া, ভিন প্রদেশে কাজের সন্ধানে যুবকদের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া, রাজনৈতিক চাপ, শিক্ষা-সচেতনতার অভাব একাধিক সমস্যার জন্ম দেয়। দ্বন্দ্ব হিংসার আড়ালে গ্রাম সমাজ ভেঙে যায়। তৈরি হয় সাংস্কৃতিক সংকট, জাতিসত্তার সংকট। এ-সবই উপন্যাসের আধার হয়ে সময় প্রেক্ষিতে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই উপন্যাসের ব্যাখ্যান থেকে আমরা সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বেশ কিছু উপাদান পেয়ে যাই।

রাজবংশী উপন্যাসে মূলত এই বিবর্তনের ছবিটাই বিভিন্ন আঙ্গিকে লেখকের মনোভঙ্গিতে ধরা পড়েছে। রাজবংশী গল্পের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কালের সামাজিক প্রক্ষেপ, রাজবংশী আর্থ-সামাজিক সংকট, সংস্কৃতির কথা, অভিবাসনের চাপ, রাজনৈতিক চাপ ইত্যাদি বিষয়গুলি ধরা পড়েছে। মূলত রাজবংশী সমাজের পিছিয়ে পড়ার ভাষ্যগুলি গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে সময়কালকে চিহ্নিত করেছে। যা সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সমীকরণ ও বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ। কবিতায়ও প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে। প্রকৃতির আবহে রাজবংশী সমাজের অবস্থান নির্ণয়ে চেতনাবোধ, অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়গুলি কাব্য রচনার আধার হয়েছে। আবার কবিতায় সময়কাল অবস্থাও ধরা পড়েছে উত্তর আধুনিকতার গুণ বৈশিষ্ট্যে।

শুধু গল্প, কবিতা, উপন্যাস নয় রাজবংশী ভাষায় সাহিত্য চর্চার অন্যতম অংশ হয়ে ওঠে প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে চেতনা-চিন্তার বিকাশ ঘটানোর প্রয়াস দেখা যায় সত্তর-আশির

দশকে। ভাষা নিয়ে, সংস্কৃতি নিয়ে সমাজ অর্থনীতি বিষয়ক বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পেতে থাকে। অনেকে প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সাহিত্য চর্চায় ব্রতী হন। যা সামগ্রিক সাংস্কৃতিক বিবর্তনের একটি অংশ। গল্প, কবিতা, উপন্যাসের পাশাপাশি প্রবন্ধ সাহিত্য চর্চার মধ্যে রাজবংশী ভাষায় সাহিত্য চর্চার বিষয়টি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে বিংশ শতাব্দীর কয়েক দশকে।

স্বাভাবিকভাবে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণে রাজবংশী ভাষায় সাহিত্য চর্চার পরিসরে আমরা পেয়ে যাই স্বাধীনতার পরবর্তীকালের বিস্তৃত ছবি। যে বিষয়গুলি সাংস্কৃতিক বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে বিভিন্ন আঙ্গিকে। আবার উত্তরণের প্রসঙ্গে সমাজচেতনতা, সংঘবদ্ধ ঐক্য প্রয়াস এবং উদ্যোগের বিষয়গুলিও রাজবংশী ভাষায় সাহিত্যচর্চার মধ্যে সম্পৃক্ত হয়। সত্তর-আশির দশকে রাজবংশী সমাজের মধ্যে শোষণ-বঞ্চনা, ক্ষোভ-বিক্ষোভ, সংগঠন, প্রতিবাদ, আন্দোলন, অবরোধে অস্থির সময়ে রাজবংশী সমাজের কিছু মানুষ ভাষা নিয়ে সচেতনতা, সাহিত্য-সৃজনে ব্রতী হয় যা সাংস্কৃতিক বিবর্তনেরই অংশ। এর মধ্য দিয়ে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির কথা শুধু নয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়গুলি ভিন্ন মাত্রায় উচ্চারিত হয় লিখিত সাহিত্যের মধ্যে। বস্তুত বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির বিবর্তন ত্বরান্বিত হয় নানাবিধ কারণে। অভিবাসনের চাপ, অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া, আধিপত্যহীনতা, ভূমিচ্যুত হওয়া, একটা অংশের শহরমুখী হওয়া, মধ্যবিত্ত মানসিকতা, সাংস্কৃতিক ঔদাসীন্য এবং রাজনৈতিক কারণে গ্রাম সমাজের পরিবর্তন ঘটে। যা সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পক্ষে সহায়ক হয়। বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত পরিসরে যেমন অতীত সময়ের আখ্যান, সমাজ সংস্কৃতির বিষয়গুলি উঠে আসে তেমনি রাজবংশী সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্বের সময় প্রেক্ষিতে রাজবংশী সমাজ অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক পরিসরটি উঠে আসে। যার মধ্য থেকে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের একটি দলিল তৈরি হয়। রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনে এই সাহিত্য-সৃজন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা সময়কালের নিরিখে বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ধারাবাহিক বিবর্তন-পরিবর্তন-উত্তরণের ভাষ্যলিপি হিসাবে চিহ্নিত হয়। বস্তুত বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তন নানাবিধ কারণে ত্বরান্বিত হয় যা রাজবংশী সাহিত্যের উপন্যাসে ধরা পড়ে।

তথ্যসূত্র :

১. খাঁ চৌধুরী, আমানতউল্লা খান; কোচবিহারের ইতিহাস (১ম খণ্ড), ১৯৩৬

২. খাঁ চৌধুরী, আমানতউল্লা খান; কোচবিহারের ইতিহাস (১ম খণ্ড), ১৯৩৬

৩. রায়, হরিপদ; কোচবিহারে বহিরাগতদের আগমন ও আর্থসামাজিক বিবর্তন, উত্তরপ্রসঙ্গ, দেবব্রত চাকী (সম্পা), কোচবিহার জেলা সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০১৬, পৃষ্ঠা - ৫৯

৪. পাল, নৃপেন্দ্রনাথ; কোচবিহার রাজ্যের ইতিহাস (প্রবন্ধ), পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার জেলা সংখ্যা পৃষ্ঠা - ১১

৫. রায়, জ্যোতির্ময়; রাজবংশী সমাজ দর্পণ - ২, দি সী বুক এজেন্সী, কল, ২০১৬, পৃষ্ঠা - ১১৫

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগবতীচরণ; কোচবিহারের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, ২০০৬, পৃঃ ১৫৩

৭. অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও পঞ্চানন বর্মা, ১ম খণ্ড, রিডার্স সার্ভিস, পৃঃ - ২৯

৮. মজুমদার, অরুণভূষণ; প্রত্যুষ ও প্রদোষকালের কামতা-কোচবিহার, নিউ দিল্লী, পৃঃ - ১০২

৯. ঐ, পৃঃ - ১০৮

১০. Sanyal, Charu Chandra; The Rajbanshis of North Bengal, Kolkata, 1965, Page - 149-50

১১. ঐ, পৃঃ - ১৩৯

১২. মুখোপাধ্যায়, শিবশংকর; জলপাইগুড়ি জেলার সামাজিক কাঠামো, মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা - ১৫৩-৫৪
মনিরাম কাব্যভূষণ 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় দীপক', দিনাজপুর, ১৩১৮, পৃঃ ৪০-৪১

১৩. ঐ, কোচবিহারের সামাজিক কাঠামো, মধুপর্ণী, কোচবিহার জেলা সংখ্যা, ১৯৯০, পৃঃ ১১০

১৪. বসু, স্বরাজ; 'Dynamics of Caste movement : The Rajbanshis of North Bengal (1910-1947) New Delhi 2005, Page - 47

১৫. রায়, গিরিজাশংকর; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির পূজা-পার্বণ, এন. এল. পাবলিকেশন, ডিব্রুগড়, অসম, পৃষ্ঠা - ৭৯

১৬. সান্যাল, চারুচন্দ্র; রাজবংশীস অফ নর্থ বেঙ্গল, চারুচন্দ্র সান্যাল, দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা - ১৩৭

১৭. Sunder, D H; Survey of the Western Duars in the District of Jalpaiguri, Page - 56

১৮. রায়, গিরিজাশংকর, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, পৃষ্ঠা - ১৩০

১৯. ঐ, পৃষ্ঠা - ৩০

২০. Rajguru, Saktipada; Medieval Assam's Society 1224-1626 (Nowgoan) 1988 P - 94

২১. সাত্তার, আব্দুস; আরণ্য জনপদে, পৃঃ - ৩৬১
Britinica Encyclopedia Ready Referrence USA; Britania Inc, 1985, P - 925-926
অশোক বিশ্বাস, বাংলাদেশের রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত পৃ: ৩৩

২২. রাজগুরু, এস; বন্দ্যোপাধ্যায় শেখর ও দাশগুপ্ত , অভিজিৎ (সম্পা), জাতি, বর্ণ ও বাঙ্গালী সমাজ, দিল্লী, পৃ: ৯২

২৩. শিনকিচি তানিগুচি, উত্তরবঙ্গ ও অসমের রাজবংশী সম্প্রদায়, ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনশীল কাঠামো, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পা), জাতি, বর্ণ ও বাঙ্গালি সমাজ, দিল্লী, পৃষ্ঠা - ১৬২

২৪. ঐ, শিনকিচি তানিগুচি, প্রাগুক্ত ১৬৯

২৫. সমর পাল, প্রাগুক্ত
'জেলার আদিবাসী ঃ নৃতাত্ত্বিক পরিচয়'
রংপুর জেলার ইতিহাস (সম্পাদনা), জেলা প্রকাশন, রংপুর, ২০০০, পৃষ্ঠা - ৯৯

২৬. Nath, D.; History of the Koch Kingdom 115-1615 (Delhi, 1989), P - 165

২৭. দেব, রণজিৎ; উত্তরবঙ্গের সমাজ জীবন ও সংস্কৃতি, রতন বিশ্বাস (সম্পাদিত), উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি (কল, পুনশ্চ ২০০১), পৃ: ৬৯

২৮. বিশ্বাস, অশোক, বাংলাদেশের রাজবংশী জাতিগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি, প্রসূন বর্মন (সম্পাদিত), নাইনথ কলাম-১৪, রাজবংশী কোচ-রাজবংশী (বিশেষ সংখ্যা), মালিগাঁও চারি আলি, গুয়াহাটি, ২০১৭, পৃ: ২৪১

২৯. বর্মা, সুখবিলাস; রাজবংশী সমাজের আত্মপরিচয় ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে, ইছামুদ্দিন সরকার (সম্পা), এন, এল, পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, আসাম, ২০০২, পৃষ্ঠা - ১৭০

৩০. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৬১

৩১. সেন, সুকুমার; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ: ৩৪৩

৩২. Gait, Sir Edward; A History of Assam, 2005, (reprint) P - 50

৩৩. রায়, দীপক কুমার; তিস্তা বুড়ি, টেরাকোটা, বাঁকুড়া, পৃষ্ঠা - ১০

৩৪. বর্মা, সুখবিলাস; জাগ গান, পুস্তক বিপণি, কল - ৯, পৃষ্ঠা - ৫০

৩৫. বর্মা, সুখবিলাস; জাগ গান, পুস্তক বিপণি, কল - ৯, পৃষ্ঠা - ৭০

৩৬. পাল, ড. নৃপেন্দ্রনাথ (সম্পাদনা); রাঁধাকৃষ্ণ দাসবৈরাগীর গোসানীমঙ্গল, অণিমা প্রকাশনী, কল - ৯, পৃষ্ঠা - ৭০

৩৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার; বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, পরিবর্তিত সংযোজন অধ্যাপক ড. দিলীপকুমার মিত্র, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কল - ৭৩, পৃষ্ঠা - ১৪৪